লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ৮ম সংখ্যা
৩১ অক্টোবর, ২০০৫ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

ঈদের আনন্দ হোক সবার জন্য

পবিত্র মাহে রমযানের রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের দিনগুলো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসছে ঈদুল-ফিতর, খুশির দিন, আনন্দের দিন। আমাদের প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল-ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আমরা আনন্দের এ দিনটি পেয়েছি। আনন্দের এ দিনটিকে শুধু বরণ করলেই চলবে না একে অর্থবহ করতে হবে। এ আনন্দকে অর্থবহ করার পন্থা হলো, প্রথমত ঈদকে নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যের মাঝেও বিলিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত রমযানে আমাদের যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেটাকে ধরে রাখতে হবে, জীবনের অংশ বানিয়ে নিতে হবে। এ ঈদ যেন অনন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করে। তাহলেই আমাদের রমযান হবে সার্থক, হবে যথার্থ ঈদের দিনের আনন্দ উৎসব। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর একটি উক্তি স্মর্তব্য–

"যদি তোমরা জান, মাল সম্মানের কুরবানী পেশ করে দিয়ে থাকো এবং অঙ্গীকার পুরা করে দিয়ে থাকো, তাহলে বুঝবে, তোমাদের ঈদুল-ফিতর সঠিক ও সার্থক হয়েছে।"

ঈদের আনন্দ যেন সবার কাছে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এজন্য ঈদ আমাদের উপর কিছু দায়িত্বও নিয়ে আসে। আর এ দায়িত্ব হলো বিত্তশালীরা যেন এ আনন্দের দিনে তাদের বিত্তহীন ভাইদের কথা না ভুলে তাদের কাছে যায়, কুশলাদি জিজ্ঞেস করে। ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, বুকে জড়িয়ে নেয়। এজন্য ইসলামে ফিৎরানা, ফিদিয়া, ঈদফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাতে এর মাধ্যমে অভাবী, গরীব দুঃখী ও অসহায় মানুষের মাঝেও ঈদের দিনে আনন্দের হাসি ফুটানো যায়। তারা যেন সেই দিন অভাব ভুলে সবার সাথে আনন্দে মেতে উঠতে পারে। ঈদটা কোন এক শ্রেণীর না হয়ে যেন হয় সবার।

কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য মুসলমানদের মাঝে খেলাফত ও বায়তুল মাল না থাকায় তারা এ শিক্ষা থেকে উপকৃত হতে পারছে না। তাদের মাঝে ফিৎরানা, ফিদিয়া ও ঈদফান্ডের টাকা সঠিকভাবে আদায় ও সঠিক স্থানে বিতরণের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে জামাতে আহমদীয়া আখারিনদের জামাত হওয়ায়, আমাদের মাঝে খেলাফত ও বায়তুল মাল থাকায় আমরা এ শিক্ষা ও সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি।

আল্লাহ্ করুন, অন্যরাও খেলাফতের এ কল্যাণ লাভ করুক। খেলাফতের গন্ডিতে চলে আসুক। আর এ ঈদ হোক সার্বজনীন। ঈদের আনন্দে সবাই মেতে উঠুক। ঈদের আনন্দে মুখরিত হোক আমাদের চারপাশ। মুসলিম উম্মাহ্র ঘরে ঘরে ফুটে উঠুক আনন্দের হাসি।

৩১ অক্টোবর, ২০০৫ইং

সূচীপত্র — পৃষ্ঠা নং

- **কুরআন শরীফ** ৩
- **হাদীস শরীফ** ৪
- **অমৃতবাণী** ৫
- **ঈদুল ফিতরের খুতবা ঃ**
  হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রাহেঃ)-এর পক্ষ থেকে বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বন্ধুগণকে ঈদ মুবারকের তোহ্ফা ৬-৭
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে)
  অনুবাদ– *মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- **জুমুআর খুতবা ঃ** ৮-১৫
  রমযানের শেষ দশক ও দোয়ার মাহাত্ম্য
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ রাবে (রাহে)
  অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
- **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র** ১৬-১৮
  সংকলন– *ইয়াকুব আলী ইরফানী*
  অনুবাদ– *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*
- **ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ?** ১৯-২১
  হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)
  অনুবাদ– *শাহ মুস্তাফিজুর রহমান*
- **কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত** ২২-২৩
  অনুবাদ– *নাজির আহমদ ভুঁইয়া*
- **ঈদ উৎসব-ই না ইবাদতও** ২৪
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **যাকাত ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়** ২৫-২৭
  অনুবাদ– *মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- **রমযানের রোযা জিহাদে আকবর** ২৮
  অনুবাদ– *মাওলানা রইস আহমদ*
- **খেলাফত– ইসলামের সঞ্জীবনী ব্যবস্থা** ২৯-৩১
  অনুবাদ– *এ. কে. রেজাউল করীম*
- **খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান** ৩২-৩৩
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নেতৃবৃন্দের বিবৃতির আলোকে খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আসল চেহারা** ৩৪-৩৫
  শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন
- **এমটিএ ডাইজেস্ট** ৩৬-৩৭
  সংকলন– *আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক*
- **সংবাদ** ৩৮

প্রচ্ছদ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

ছবি ঃ হাফিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ
لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৩। তারা কি জানে না, যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শত্রুতা করে নিশ্চয় তার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে? এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ
بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ
مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। মুনাফিকরা ভয় পায়,[১১৯৫] পাছে তাদের বিরুদ্ধে এমন কোন সূরা নাযেল না হয়ে যায়, যা এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তাদের মনের গোপন কথা জানিয়ে দেবে। তুমি বল, 'তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যে বিষয় ভয় করছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রকাশ করেই ছাড়বেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ
قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা যে কেবল খোশ-গল্প ও হাসি-তামাশায় মত্ত ছিলাম। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রসূলের বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল'?

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ
طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তোমরা (তোমাদের অপরাধের) কোন সাফাই গেয়ো না, নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। আমরা তোমাদের এক দলকে মার্জনা করলেও অন্য এক দলকে তাদের অপরাধী হওয়ার দরুন নিশ্চয় শাস্তি দিব।

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ
نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। মুনাফিক[১১৯৬] পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা (স্বভাব-চরিত্রে) একে অন্যের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎকাজে বাধা দেয় এবং তাদের হাতকে (আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা থেকে) গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।[১১৯৭] নিশ্চয় মুনাফিক্‌রাই দুষ্কর্মপরায়ণ।

১১৯৫। মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ভয় মনে স্থান দিত না, কারণ তারা রসূল করীম (সঃ)-এর ঐশী বাণী প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতো না। এ আয়াত কেবল তাদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক প্রকৃতির পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র।

১১৯৬। 'মুনাফিক' নাফাক্ শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ ছিদ্র বা সরু গলিপথ যা মাটির ভিতর দিয়ে অপর প্রান্তে কোন স্থানে বের হয়, এবং আন নিফাক-এর অর্থ এক দরজার মাধ্যমে ঈমান প্রবেশ করা এবং তা ত্যাগ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া (আক্‌রাব)।

১১৯৭। 'নিস্‌ইয়ান' সাধারণ অর্থে ভুলে যাওয়া, প্রকৃতভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে বা উদাসীনতার জন্য অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া বুঝায়। 'নিস্‌ইয়ান' শব্দ যখন আল্লাহ্‌তাআলা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তখন এর মর্ম কোন ব্যক্তির প্রতি শাস্তি প্রদানের দ্বারা বা ভালবাসা ও স্নেহের প্রকাশ বন্ধ করার দ্বারা সেই ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্কচ্ছেদ করাকে বুঝায় (মুফরাদাত)।

হাদীস শরীফ

রোযার মাহাত্ম্য

১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, বেহেশ্তের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছেঃ রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় (মুত্তাফাক আলায়হি)।

২। হযরত সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বেহেশ্তের আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়্যান'। রোযাদারগণ ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। (মুত্তাফাক আলাইহি)।

৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানব সন্তানের পুণ্যকর্ম বাড়ান হয়ে থাকে; প্রত্যেক পুণ্যকর্ম দশগুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ্ বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা আমারই জন্যে এবং আমিই ইহার প্রতিদান করব (যত ইচ্ছা তত)। সে আমারই জন্যে আপন প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানীয়ের জিনিস ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দু'টি (প্রধান) আনন্দ রয়েছে ঃ একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশ্তে আপন প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মেশকের সুগন্ধ অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিকর। রোযা হচ্ছে মানুষের জন্যে (দোযখের আগুন হতে রক্ষার) ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারও নিকট রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে আমি একজন রোযাদার (মুত্তাফাক আলায়হি)।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোযা এবং কুরআন (কেয়ামতে) আল্লাহ্র নিকট বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে তার খাবার ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন (বায়হাকী)।

৫। হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাস আসলো। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন, এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, এতে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে, আর উহা হতে চিরবঞ্চিত ব্যক্তি ব্যতীত কেউই বঞ্চিত হয় না (ইবনে মাজা)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

রিয্‌কের অর্থ

'ওয়ামিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউনফিকূন' রিয্‌ক বলতে শুধু ধনকে বুঝায় নি। বরং যা কিছু তাকে দেয়া হয়েছে বিদ্যা, কলা-কৌশল, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, এসব কিছু রিয্‌কের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্য থেকেই তাকে খোদার পথে ব্যয় করতে হয়। এই পথে মানুষকে ক্রমান্বয়ে এবং ধাপে ধাপে উন্নতি করতে হবে, ইঞ্জিলের ন্যায় যদি এই শিক্ষা দেয়া হতো যে, এক গালে চড় খেয়ে আরেক চড়ের জন্য অপর গাল এগিয়ে দিতে হবে তাহলে ফল এই দাঁড়াতো যে, মুসলমানগণও খৃষ্টানদের ন্যায় পালনের-অযোগ্য শিক্ষার কারণে পুণ্য অর্জনে বঞ্চিত থেকে যেতো।

মানুষের স্বভাবের অনুপাতে কুরআন ধীরে ধীরে উন্নতি দান করে

কিন্তু কুরআন তো মানুষের স্বভাবের অনুপাতে ধীরে ধীরে (ক্রমান্বয়ে) উন্নতি দান করে থাকে, ইঞ্জিলের তুলনা তো ঐ বালকের ন্যায়, স্কুলে ভর্তি হওয়া মাত্রই যাকে অতি কঠিন পুস্তক পাঠে বাধ্য করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা হলেন জ্ঞানী, তাঁর প্রজ্ঞার এই চাহিদা থাকাটাই সংগত ছিল যেন ক্রমোন্নতির ধারায় শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

এরপর মুত্তাকীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ অর্থাৎ "সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যে পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরবর্তী কালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।" এ কাজও আনুষ্ঠানিকতাশূন্য নয়। ঈমান এখনও প্রচ্ছন্ন অবস্থায় হয়েছে। মুত্তাকীর চক্ষু আধ্যাত্মিক ও দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন নয়। তাকওয়ার মাধ্যমে শয়তানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এ পর্যন্ত সে একটি কথাকে জেনে নিয়েছে। বর্তমানে এরূপই আমার জামাতের অবস্থা। তারাও তাকওয়ার মাধ্যমে মেনে তো নিয়েছে কিন্তু এখনো তারা জানে না যে এই জামাত আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্যে কি পরিমাণ ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে! সুতরাং এটি হলো একটি বিশ্বাস, পরিণামে যা ফলপ্রসূ হবে।

সাধারণভাবে 'এক্বীন' (দৃঢ়বিশ্বাস) শব্দটি ব্যবহার হলে এর দ্বারা মর্যাদার নিম্নস্তর বুঝায়। অর্থাৎ জ্ঞানের তিনটি স্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের জ্ঞান, অর্থাৎ যুক্তিমূলক জ্ঞান। এই স্তরে খোদা-ভীরুদের অবস্থান। কিন্তু পরবর্তীতে তাকওয়ার (খোদা-ভীতির) সকল স্তর পেরিয়ে 'প্রত্যক্ষমূলক' ও 'অভিজ্ঞতামূলক, জ্ঞানের মর্যাদাও তারা অর্জন করে থাকে।

প্রত্যক্ষমূলক তাকওয়া কোন সামান্য জিনিস নয়

তাকওয়া কোন সামান্য জিনিস নয়। এর মাধ্যমে ঐ সমস্ত শয়তানের মোকাবেলা করতে হয় যা মানুষের প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ বল ও শক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এই সমস্ত শক্তি নাফ্‌সে আম্মারা (ভর্ৎসনাকারী আত্মা) রূপে মানুষের মধ্যে অবস্থান করছে। সংশোধিত না হলে (শয়তান) মানুষকে গোলাম বানিয়ে নেবে। জ্ঞান-বুদ্ধিই অন্যায়মত ব্যবহৃত হয়ে শয়তানে রূপান্তরিত হয়। মুত্তাকীর কর্তব্য হলো ওগুলোর এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলোর সমন্বয় সাধন করা। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সকল ক্ষেত্রে প্রতিশোধ, শাস্তি ও বিবাহকে খারাপ জ্ঞান করে সে-ও ঐশী বিধানের বিরোধী এবং মানবীয় শক্তি ও গুণাবলীর মোকাবেলা করে।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রাহেঃ)-এর পক্ষ থেকে বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বন্ধুগণকে ঈদ মুবারকের তোহ্ফা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ ইসলামাবাদে ২ ডিসেম্বর, ২০০০ ইং প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা]

আল্লাহ্তাআলা নিজের অনুগ্রহের প্রভাব তাঁর বান্দাদের মাঝে দেখতে পসন্দ করেন।

নেয়ামতের কথা প্রকাশ করার অর্থ এই নয়, মানুষ কেবল মুখেই তা বলতে থাকে বরং দেহেও এর প্রভাব বিকশিত হওয়া আবশ্যক।

নেয়ামতের স্বীকৃতির একটি দিক হলো, খোদার সৃষ্টির সেবা। আর এতে আবশ্যিক শর্ত এই, খোদাতাআলার সন্তুষ্টির খাতিরেই এ পুণ্যের কাজ হওয়া আবশ্যক।

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (রাহেঃ) সূরা যূহার ৭-১২ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝
وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝
فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝
وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

এর সরল অনুবাদ এই, তিনি কি তোমাকে এতীম পান নি এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেন নি, আর তোমাকে (ঐশী-প্রেম ও মানব-প্রেমে) আত্মহারা পান (নি)? এরপর তিনি (তোমাকে খোদা প্রাপ্তির ও মানব সংশোধনের জন্য) পথ প্রদর্শন করলেন। আর তোমাকে অভাবগ্রস্ত পেলেন, এরপর সম্পদশালী করলেন। অতএব এতীমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না। এবং সাহায্যপ্রার্থীকে তুমি তিরস্কার করো না, আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের যে নেয়ামত তোমার ওপর রয়েছে তুমি অবশ্যই (অন্যের নিকট) তা বেশি বেশি বর্ণনা কর।

এ প্রসঙ্গে আমি সবার আগে তিরমিযীর কিতাবুল আদব থেকে একটি হাদীস উপস্থাপন করছি ঃ হযরত আমর বিন শুয়ায়েব (রাঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে আর তিনি তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা এ কথা পসন্দ করেন যেন তিনি তাঁর কল্যাণের প্রভাব তাঁর বান্দার ওপর দেখেন। অর্থাৎ খোদাতাআলা যে কল্যাণ দিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হওয়া পুণ্যের কারণ হয়ে থাকে। মুসলিম কিতাবুয্যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্বের এবং বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব থেকে উদ্ধৃত অন্য একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তার প্রতি দেখ যে তোমার চেয়ে কম মর্যাদার লোক অর্থাৎ কম চাহিদার লোক। আবার সেই ব্যক্তির প্রতি দেখবে না যে তোমার চেয়ে ওপরে রয়েছে অর্থাৎ তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে। এ রকম রীতি সেই কথারই অধিক প্রমাণ বহন করে, তুমি নিজের ওপর বর্ষিত কল্যাণকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে না।

বুখারীর অন্য আর একটি বর্ণনায় এ-ও এসেছে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তির প্রতি যদি দেখে যাকে আর্থিক ও দৈহিক দিক থেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তাহলে তার প্রতিও তুমি দেখ, যে তার চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোক। এভাবে কল্যাণ লাভের কৃতজ্ঞতা সঠিক অর্থে আদায় হতে পারে। সব মানুষ সমান নয়। কেউ উঁচু মর্যাদার কেউ মর্যাদায় নিচু। মানুষ কেবল উঁচু মর্যাদার লোকদেরই দেখতে থাকলে এতে হিংসা সৃষ্টি হবে। ঈর্ষা তো বৈধ কিন্তু হিংসা বৈধ নয়। কিন্তু এক উঁচু মর্যাদার লোকের প্রতি দেখা হলে তাকেও দেখা হোক যে তাথেকে নিচু মর্যাদার লোক। যাদের শিশুরা অসুস্থ বা আরও কোন কষ্টে পড়েছে তখন তার অবস্থা দেখে কল্যাণের কৃতজ্ঞতা যথাযথভাবে আদায় হতে পারে নচেৎ মানুষের নিজ অবস্থা সম্বন্ধে তার ধারণা সৃষ্টি হয় না।

আল্লাহ্তাআলা এ কথা পসন্দ করেন যেন তিনি তাঁর কল্যাণের প্রভাব তাঁর বান্দার ওপর দেখেন। অর্থাৎ খোদাতাআলা যে কল্যাণ দিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হওয়া পুণ্যের কারণ হয়ে থাকে।

কল্যাণের কথা বলে বেড়ানোর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, খোদার সৃষ্টির সেবা করা। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা কেয়ামতের দিন বলবেন, হে ইবনে আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে খাবার খাওয়াও নি। সে বলবে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমিতো বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক, আমি তোমাকে কিভাবে খাবার খাওয়াতাম। আল্লাহ্তাআলা বলবেন, তোমার কি জানা নেই, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট

খাবার চেয়েছিলো আর তুমি তাকে খাওয়াও নি। তুমি কি এটা বুঝতে পার নি যে, তুমি তাকে খাবার খাওয়ালে তুমি যেন আমাকেই খাবার খাওয়াতে। কেননা, আমার সন্তুষ্টির খাতিরেই তাকে তুমি এ খাবার খাওয়ালে। আবার বলবেন, হে ইবনে আদম! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নি। সে বলবে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমাকে কেমনে পানি পান করাতাম। আল্লাহ্‌তাআলা বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিলো। তুমি তাকে পানি পান করাও নি। তুমি কি এটা বুঝতে পার নি, তুমি তাকে আমার সন্তুষ্টির খাতিরে পানি পান করালে তুমি যেন এ পানি আমাকেই পান করাতে আর আমি তোমাকে এর সওয়াব দিতাম।

এতে আবশ্যিক শর্ত এই, এ পুণ্য কর্ম খোদাতাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন লোকের মন থেকে এমনিতেই পুণ্যের কথা জাগরিত হয়। সে তা করেও থাকে। অথচ সে খোদার প্রতি ঈমান রাখে না। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে তার কোন প্রতিদান নেই। প্রতিদান তো তাঁরই যে পুণ্য কাজ খোদার খাতিরে করা হয় আর তাকে আল্লাহ্‌তাআলা ভরপুর প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,
"স্মরণ রাখো! তুমিও আমাদের সাক্ষাৎ ও সৌন্দর্যের প্রত্যাশী। আর আমাদের মাহাত্ম্য ও উদ্দেশ্যের আকাঙ্ক্ষী ছিলে। সুতরাং যেভাবে আমরা পিতার স্থলে থেকে তোমার দৈহিক পরিপোষণ করেছি তেমনি আমরা শিক্ষকের স্থানে থেকে জ্ঞানের সমস্ত স্তরকে তোমার নিকট খুলে দেই ও আমার সাক্ষাতের শরবত সবচে' অধিক দান করি। আর তুমি যা চেয়েছো সেসব আমরা তোমাকে দিয়েছি। সুতরাং তুমিও প্রার্থীদেরকে বঞ্চিত করো না আর তাদেরকে ধমক দিও না এবং স্মরণ রেখো, তুমি অয়েল (অর্থাৎ যার অনেক বড় পরিবার) ছিলে আর তোমার জীবনোপকরণের বাহ্যিক উপকরণ একবারেই কিছু ছিল না। সুতরাং খোদা স্বয়ং তোমার অভিভাবক হন এবং অন্যদের প্রতি হাত পাতা থেকে তোমাকে অভাবমুক্ত করে দেন। পিতারও মুখাপেক্ষী হও নি আর মাতারও হও নি। শিক্ষকেরও না আর কারও প্রতি হাত পাতারও প্রয়োজন হয় নি বরং এসব কাজ খোদাতাআলা স্বয়ং নিজেই করে দিয়েছেন। আর জন্মের পর থেকেই তিনি তোমার পরিচর্যা করেছেন। সুতরাং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আর অভাবীদের সাথে তুমিও এমনই আচরণ করো" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩)।

অন্য আর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার জন্যে আবশ্যকীয় শর্ত বিনয়-নম্রতা; কিন্তু আয়াতে করীমার আদেশ মোতাবেক –ওয়া **আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস**–ঐশী কল্যাণগুলো প্রকাশ করাও অত্যন্ত জরুরী (মকতুবাতে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, ২য় অংশ পৃষ্ঠা-৪৬)।

এ ছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "স্মরণ রাখো, মানুষের সর্বাবস্থায় দোয়ার প্রার্থী হয়ে থাকা আর **আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস**-এর ওপর আমল করা উচিত। খোদাতাআলা প্রদত্ত নেয়ামত ও কল্যাণসমূহের কথা প্রকাশ করা উচিত। এতে খোদাতাআলার ভালবাসা বাড়ে এবং তাঁর আনুগত্য ও তাঁকে মান্য করার জন্যে একটি আবেগ সৃষ্টি হয়। প্রকাশ করার এ অর্থই নয় যে, মানুষ কেবল মুখে উচ্চারণ করতে থাকে বরং দেহের ওপরও এর প্রভাব পড়া আবশ্যক। যেমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তাআলা ভাল কাপড় পড়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন কিন্তু সে সব সময় নোংরা-ময়লা কাপড় পরে এবং মনে করে যেন তাকে দয়ার পাত্র মনে করা হয় বা তার স্বচ্ছল অবস্থার প্রকাশ যেন আর কারও কাছে না হয় - এমন ব্যক্তি পাপ করে। কেননা, সে খোদাতাআলার অনুগ্রহ ও বদান্যতাকে লুকোতে চায় আর কপটতার সাহায্য নেয়। ধোঁকা দেয়, ভুল ধারণা দিতে চায়। এটা মু'মিনের মর্যাদা থেকে অনেক দূরে.....

খোদাতাআলা প্রদত্ত নেয়ামত ও কল্যাণসমূহের কথা প্রকাশ করা উচিত। এতে খোদাতাআলার ভালবাসা বাড়ে এবং তাঁর আনুগত্য ও তাঁকে মান্য করার জন্যে একটি আবেগ সৃষ্টি হয়। প্রকাশ করার এ অর্থই নয় যে, মানুষ কেবল মুখে উচ্চারণ করতে থাকে বরং দেহের ওপরও এর প্রভাব পড়া আবশ্যক।

আমাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তম আদর্শ। আমাদের মঙ্গল ও সৌন্দর্য এতে নিহিত যেন যতটা সম্ভব তাঁর (সঃ) পদ-চিহ্ন অনুসরণ করি এবং এর পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ না রাখি" (আল্ হাকাম, ৭ম খন্ড, ১৩ নম্বর, ১০-৪-১৮৯৩ ঈসাব্দ, পৃষ্ঠা ১-২)।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মলফূযাতের দ্বিতীয় খন্ডে বলেন ঃ

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখো! যে-ব্যক্তি খোদাতাআলার অনুগ্রহের ওপর সন্তুষ্ট হয় না এবং তা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করে না সে নিষ্ঠাবান নয়। আমার ধারণায়, যদি কোন ব্যক্তি খোদাতাআলার অনুগ্রহ সম্পর্কে সারা বছর ধরে প্রশংসা গাইতে থাকে তাহলে সে সারা বছর ধরে শোক প্রকাশকারীর চেয়ে উত্তম। যে বিষয় 'আল্লাহ্ বলেছেন' ও 'আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন'-এর পরিপন্থী হয়, অর্থাৎ তাতে শির্ক (অংশীবাদিতা), রিয়া (অহংকার) থাকে এতে যদি সে নিজের বড়াই দেখায় তাহলে এটা পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং নিষিদ্ধ।

এ সংক্ষিপ্ত ঈদের খুতবার পর এখন আমি সকল জামাতকে, যা এখানে উপস্থিত আছেন আর সেসব জামাত যা এখানে উপস্থিত নেই ঈদ মুবারক-এর তোহ্‌ফা দিচ্ছি। রাবওয়া থেকে আমাদের ভাই-বোনের এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ, তদুপরি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ-এর কর্মকর্তাগণ, যা কোনভাবেই আমার প্রিয়গণের চেয়ে কম নয়, ঈদ মুবারকের বাণী পাঠিয়েছেন। তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে ঈদ মুবারক। এভাবে আসীরানে রাহে মাওলা (খোদার পথে বন্দীগণ) এবং তাদের পরিবারবর্গ তাছাড়া আহমদীয়তের শহীদগণের পরিবারবর্গকে আমার পক্ষ থেকে ও নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে আন্তরিক ঈদ মুবারক।

এভাবে প্রায় সব দেশ থেকে অর্থাৎ জাপান, আমেরিকা, আফ্রিকা ও যত দেশ রয়েছে সব দেশ থেকে ঈদ মুবারক-এর বাণীতে আমার ফাইল ভরে গেছে। এতো আমার পক্ষে সম্ভবই নয় যে, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জবাব পাঠাই কিন্তু এদের সবাইকে আমি এতদোপলক্ষ্যে ঈদ মুবারক-এর তোহ্‌ফা দিচ্ছি। এভাবে ই'তিকাফকারীগণ রয়েছেন, যাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য দোয়ার পত্র পাওয়া গেছে। আল্লাহ্ তাদের ই'তিকাফ গ্রহণ করুন। এদের সবার আলাদা আলাদা নাম নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে 'ঈদ মুবারক'। *(১৯-২৫ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে)* ***(পুনঃ প্রকাশিত)***

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

রমযানের শেষ দশক ও দোয়ার মাহাত্ম্য

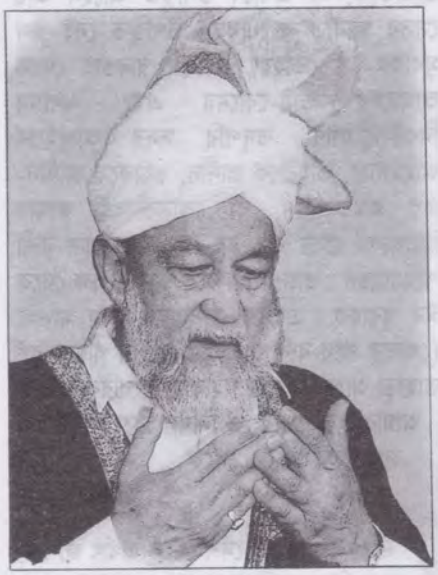

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ৮ জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং মসজিদুল-ফযল-এ প্রদত্ত]

'যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের রূহ সিজদাবনত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়া কবুল হবে না।' 'নিজেদের গৃহের জীবনের জন্য সদাসর্বদা দোয়া করুন যাতে গৃহে আল্লাহ্‌র এ যিক্‌রের দরুন গৃহ (-এর সবাই) জীবিত হয়ে ওঠে।'

তাশাহ্‌হুদ, তাআব্বুয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

আজ রাত থেকে রমযান মুবারকের আখেরী আশারাহ্ আরম্ভ হচ্ছে। এ দশকটিতে ইতেকাফকারীগণ ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁরই ভালবাসায় (আত্মমগ্ন হয়ে) ইতেকাফে বসেন এবং বিশেষভাবে দোয়া করে থাকেন। তবে সর্বাগ্রে আমি সমগ্র জামাতের পক্ষ থেকে দুনিয়া জুড়ে ইতেকাফকারী আহমদীদের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি যে, আমরা ভাইয়েরা যারা ইতেকাফের বাইরে থাকছি কিন্তু আত্মিক সূত্রে তাতে শামিল রয়েছি তাদেরকেও নিজেদের দোয়ায় যেন স্মরণ রাখেন এবং জামাতের সাধারণ সমস্যাবলীকে সম্মুখে রেখে দোয়া করেন। খোদা করুন, যেন এ ইতেকাফের রাতগুলো কেবল তাদের তকদীরকেই জাগাবার কারণ না হয় বরং জামাতের ও সমগ্র বিশ্বের ইপ্সিত নিয়তিকে জাগাবার কারণ হয়ে যায়। এই ভূমিকার পর আমি ইতেকাফ সম্পর্কিত কিছু বিষয়ও বর্ণনা করবো, যা প্রত্যেক জায়গার মুতাকিফিনদের দৃষ্টি পটে থাকা উচিত। এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণই আঁ হযরত (সঃ)-এর উপদেশাবলীর উদ্ধৃতিমূলেই বর্ণনা করবো। অতএব, এগুলোর ওপরে বাহ্যিকভাবেও এবং রূহ্ ও অন্তর্নিহিত মর্মের দিক দিয়েও পুরোপুরি আমল হওয়া উচিত।

এখন, এই আসছে দিনগুলো খাস কবুলিয়তের দিন, বিশেষভাবে দোয়া করার দিন এবং রমযান-মুবারকের মেরাজস্বররূপ এ শেষ দশকটি। এর মাঝেই একদিন লাইলাতুল কদর এর রাত্রিও হবে। এ আশারার প্রত্যেক রাতে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষভাবে ঝোঁকার এবং তাদের দোয়া কবুল করার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি এতে বিশেষতঃ সে বিষয় বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দোয়ার ওপর সামগ্রিক আলোকপাত সম্বলিত এতোই মহান এ আয়াতটি যে, তা লক্ষ্য করে মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি বিস্ময়াবাক হয়ে পড়ে। দোয়া এবং ঐশী নৈকট্যের কোনও দিক তাতে বাদ পড়েনি। এর প্রত্যেকটি দিকে এরূপ আলোকপাত এতে বিদ্যমান যে, মানুষ যদি তাতে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে এরপর দুনিয়ার কোন নাস্তিকের সামনে নত হবার কোনও অবকাশ আর থাকে না।এ বিষয়ে আয়াতটিতে এতই অকাট্য ও চিরস্থায়ী যুক্তি প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, সার্বিকভাবে এই সব বিষয় একই খুতবায় বর্ণনা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে এ আয়াতের তফসীর ব্যাখ্যায় উপস্থিত আমি কতক বিষয় বিশদভাবে তুলে ধরবো এবং এরই বিষয় বস্তুকে ঘিরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু উদ্ধৃতির মধ্যে কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। যদি সময় না বাঁচে তাহলে আগামী খুতবায়ও এ বিষযটিই অব্যাহত থাকবে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে "ইযা সায়ালাকা ইবাদী আন্নী ফাইন্নী ক্বারীব"-মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, যখন তোমার কাছে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে "ফাইন্নী ক্বারীব" তখন (বল) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে রয়েছি। 'ক্বরীব' (নিকটে) এর বহুবিধ অর্থ বর্ণিত রয়েছে কিন্তু একটি অর্থ যা আমি মনে করি সম্পূর্ণ সঠিক সত্য এবং আয়াতের পূর্বাপর বিষয়ের সাথে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ -এতে এতটুকুও কোন রায়ের আমলদখল নেই, বরং এ আয়াত এমনটি-ই বলছে। এখনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নৈকট্য বুঝায়। তাঁর নৈকট্যের দরুন খোদা নিকটে। অতএব, যে-বান্দারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে খোদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তারা কি আঁ-হযরত (সঃ)-কে অবলোকন করছে না যে, তাঁর মাঝে খোদা কথা বলেন! সুতরাং এ দিক দিয়ে এ একটি মহান আয়াত- তারা তোমার নিকট প্রশ্ন করের যে, খোদা কোথায়? তাদের দেখিয়ে দাও, তুমি সেই ব্যক্তি যার মধ্যে খোদা বিদ্যমান, তোমার মাঝে খোদা সবাক। আর এর প্রমাণ আয়াতটির পরবর্তী অংশে পেশ করা হচ্ছে। "উজীবু দা'ওয়াতাদ্

দায়ি ইযা দাআনি"- প্রথম প্রমাণ হলো এই যে, তোমার দোয়া গৃহীত হয়নি এমন কি কখনও হয়েছে? আল্লাহ্ রদ করেছেন এমন কোন দোয়া আছে কি তোমার ? অতএব, তুমি (সঃ) প্রমাণস্বরূপ খোদাতাআলার অস্তিত্বের এবং এ বিষয়ের যে, যে-দোয়া তুমি কর এবং যে ধারায় তুমি দোয়া করে থাক ঐ দোয়াসমূহ অবধারিতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই উজীবু দা'ওয়াতাদ দায়ি ইযা দায়ানি'-এ আয়াত থেকে যে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, যেন -তেন প্রত্যেকের দোয়া বুঝায় এবং যেন-তেন বলতে পারে সে অনেক দোয়া করা সত্ত্বেও তার দোয়া তো কবুল হয় নি এখানে এর প্রকৃষ্ট অপনোদন রয়েছে। কেননা, 'দায়ী' (প্রর্থনাকারী) বলতে এখানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বুঝায় আর আমার মতে এর প্রথম ও প্রধান অর্থ এটাই। অর্থাৎ 'এই প্রর্থনাকারী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র দোয়া আমি শ্রবণ করি যখন সে আমাকে ডাকে, আমি তার পাশে থাকি।' এরপর সন্দেহের আর কী অবকাশ থেকে যায়? বস্তুতঃ সমস্ত দুনিয়ার জন্যে খোদাতাআলার অস্তিত্বের ইহা এক অকাট্য-অখন্ডনীয় প্রমাণ।

আঁ হযরত (সঃ)-এর তো কেয়ামত অবধি সর্বকালের জন্যে সকল দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন এবং তাঁর ঐ সকল দোয়ারই ফল যে, আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহক্রমে ইসলাম দৈনন্দিন নিত্য নূতন সফলতা লাভে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যুগেই আঁ হযরত (সঃ)এর দোয়াসমূহ এর সাক্ষী যে, আল্লাহ্ বিদ্যমান এবং তিনি সবার চেয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র খোদা।

অতএব খোদাকে যে দেখতে চায় সে কাছে থেকে দেখে নিক, মুহাম্মদ (সঃ)-এর তার জন্যে খোদা পরিদৃষ্ট হবেন। একথাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ)এর সত্তায় আমরা আল্লাজাল্লা শানহুকে আলোকসম্পাতরত (অবস্থায়) দেখতে পাই। তাঁর আলোকসম্পাতের জন্যে অন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই। স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সত্তা প্রমাণ করছে যে, খোদাতাআলা তাঁর (সঃ)সত্তায় জ্যোতির্বিকাশ করছেন। অতএব, 'উজীবু দাওয়াতাদ দায়ি ইযা দায়ানী'-মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ যখনই আমাকে ডাকেন তখন তাকে কখনও নিরাশ করি নি আমি।

"ফাল্ ইয়াস্তাজীবূলী"-মানুষের জন্যে আদেশ এই যে, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় যেভাবে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। তবে তাদের সাথেও তদ্রূপ ব্যবহারই করবো। "ওয়াল ইউমিনূবী-এর প্রকৃত মর্ম অত্র পূর্বাপর সূত্রে এই দাঁড়ায় যে, তারা যেন তদ্রূপ ঈমান আনে যেরূপ ঈমান এনেছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। কেবল দূরে বসে ঈমানের দাবি উচ্চারণ করা তো সম্পূর্ণই বৃথা। প্রকৃত ঈমান হচ্ছে যা ইস্তে জাবত (আল্লাহ্র সমস্ত ডাকে সাড়া দান)এর পরবর্তী ঈমান হয়ে থাকে। আল্লাহ্র সব কথা গ্রহণ করা তারপরেই ঈমানের কথা বলো। আল্লাহ্র আদেশ গ্রহণ পালন ব্যতিরেকে কি করে ঈমানের কথা বলতে পার? আর যে, আল্লাহ্র কথা গহণ করে না, সে আল্লাহ্র নিকটেও নয়। আর যে আল্লাহ্ থেকে দুরে থাকে, আল্লাহ্ কী করে তার নিকটে হতে পারেন?

আঁ হযরত (সঃ)-এর তো কেয়ামত অবধি সর্বকালের জন্যে সকল দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন এবং তাঁর ঐ সকল দোয়ারই ফল যে, আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহক্রমে ইসলাম দৈনন্দিন নিত্য নূতন সফলতা লাভে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যুগেই আঁ হযরত (সঃ)এর দোয়াসমূহ এর সাক্ষী যে, আল্লাহ্ বিদ্যমান এবং তিনি সবার চেয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র খোদা।

অতএব আয়াতটিতে এক অদ্ভূত ও বিস্ময়কর বাক-ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নৈকট্যের দোয়াতো আমি অবশ্য শ্রবণ করে থাকি তবে তোমরাও তো আমার নিকেটে থাকো; তোমরা তো দূরে বসে আছো -নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছো; অতএব, আমিও দূরে আছি। বস্তুতঃ আল্লাহ্র গুণাবলীর এই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একই সময়ে সবচে' নিকেটে, আবার সবচে' দূরে। এতো দূরে যে, কল্পনাও তা নাগাল পায় না। কাজেই তোমরা দোয়া কবুলের কথা তো বল কিন্তু নিজেরা দূরে সরে থাক। অর্থাৎ পকারান্তরে আল্লাহ্ (এ আয়াতটিতে) বলছেন, আমার কথায় যখন তোমরা সাড়া দাওনা তখন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তোমরা অনেক দূরে সরে বসে আছ, বধির হয়ে গিয়েছ-বুঝতে পারছনা আমি তোমাদের কি বলছি আর (এমতাবস্থায়) যখন তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর তখন মনে কর আমি যেন তোমাদের নিকটে এসে পড়ি। তা হতে পারে না। ঐ সুন্নতই অনুসরণীয় যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আচরিত সুন্নত। আল্লাহ্তাআলা এক মুহূর্তও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যান নি। [কেননা তিনি (সঃ) সবসময় আল্লাহ্র প্রত্যেক কথায় সাড়া দেওয়ায় নিজে তাঁর কাছে থেকেছেন]। আর একারণেই প্রতি মুহূর্তই আল্লাহ্ তাঁর দোয়া শুনতেন।

"লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন"-যদি তোমারা 'হেদায়াত' (সঠিক পথ ও সফলতা) লাভ করতে চাও তাহলে এর জন্যে এটাই নির্ধারিত পন্থা। এখন রমযানের যে বিশেষ রাতগুলো আসছে এগুলোতে উক্ত পন্থায় পরিচালিত হতে হবে। যদি তদ্রূপ কর, আল্লাহ্ নির্দেশিত ঐ পন্থায় সাধনা কর, তাহলে "লাআল্লাহুম ইয়াশুদূন" আল্লাহ্র এই ওয়াদা অনুযায়ী তাঁরই অনুগ্রহক্রমে তোমরা সবাই হেদায়াত লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হবে।

এই হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য কিভাবে ঘটবে? এই ঐশী ওয়াদা কীভাবে পুর্ণ হবে? এ প্রসঙ্গে কিছু কথা এখনই আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। তবে পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী সর্বাগ্রে আমি আঁ হযরত (সঃ)এর আখেরী আশারাহ্ সম্পর্কিত কিছু হাদীস পেশ করছি যার মাঝে এসব বিষয়ের উত্তর এসে যায়- 'লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন' দ্বারা কী কী বিষয় বুঝায় ? কীরূপে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পার? এই দশ রাত্রের দ্বারা কীভাবে উপকার লাভ করতে পার? এতদ্সংক্রান্ত সকল পথ ও পন্থা আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র সুন্নত ও উক্তি থেকে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হযরত নবী করীম (সঃ) বলেন, "সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রমযানের শেষ দশকের চেয়ে মহৎ ও প্রিয় আর

কোন দিন নেই।" অর্থাৎ এই দশকে আল্লাহ্‌তাআলা অন্যান্যদেরকে মাহাত্ম্য দান করেন। নইলে, কোন দিন বা রাত আল্লাহ্‌র কাছে কী করে মহান হতে পারে? মহান এ দিক দিয়েই যে, এই দশকে আল্লাহ্‌র সংস্পর্শে যারা আসে তাদেরকে ইহা মহানে পরিণত করে। মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক যতো নিবিড় হবে যতো বৃদ্ধি পাবে, বান্দাও ততো মহানে পরিণত হতে থাকবে। এতদুদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই দশকে বহুল মাত্রায় 'তাহলীল', 'তাকবীর' ও 'তাহ্‌মীদ' করতে উপদেশ দান করেন। তাহলীল মানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তওহীদের স্বীকৃতি সম্বলিত যিকর, তাকবীর মানে 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহর সর্বব্যাপী মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি সম্বলিত যিক্‌র এবং তাহ্‌মীদ মানে 'আলহামদুলিল্লাহ্' আল্লাহ্‌র সার্বিক প্রশংসার স্বীকৃতি সম্বলিত যিক্‌র রাত-দিন অধিক মাত্রায় আবৃত্তি করতে উপদেশ দান করেন। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' উঠতে বসতে, শুয়ে জেগে, মুখে-অন্তরে আবৃত্তি করতে থাকা উচিত, হৃদয় যাতে স্পন্দিত হয় এবং মানুষ উপলব্ধি করে যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ সত্যটি খাঁটি অন্তরে যখন সে অনুভব করে তখন তকবীর আপনা-আপনি তা থেকে ফুটে ওঠে- 'আল্লাহু আকবার'-'আল্লাহ্‌ই সবচে' বড়। তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং সবচে' বড়-এই দুটো কথার মাঝে তো আপাতঃ যেন স্ববিরোধও প্রতীয়মান হয়। যখন এক অদ্বিতীয়, তখন সবচে' বড় এর অর্থ কী? অর্থ, একমাত্র তিনিই, সমস্ত বড়াই ও মাহাত্ম্য তাঁরই। অবশিষ্ট অন্য সব জিনিস তো কোনও মূল্যই রাখে না। এমনি চোখের বিভ্রমস্বরূপ যা দুনিয়াতে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ্‌রই শ্রেষ্ঠতার শীর্ষ মর্যাদা সব কিছুতে উদ্ভাসিত হতে পরিলক্ষিত হয়। তবেই কিনা তওহীদের সঠিক সত্যিকার জ্ঞান লাভ হতে পারে। যদি কারও কাছে তদ্রূপ উদ্ভাসিত না হয়, তবে এসব চোখের বিভ্রম বৈ আর কিছু নয়। অতএব, 'আকবর' একমাত্র সেই খোদা, সমগ্র বিশ্ব জগতের যিনি মালিক। তাহ্‌লীলের দ্বারা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠতা আপনাদের উপর সমুজ্জ্বল হবে। আর যারা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হন যিনি সবচে' মহান সেই আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে অবধারিতভাবে তাদেরকে সেই মাহাত্ম্য ও মহানত্ব লাভের সৌভাগ্য দান করা হয়, যা খোদার গোলামদেরকেই দান করা হয়ে থাকে-যে মহানত্ব আঁ হযরত (সঃ)-কে সবচে' বেশি দান করা হয়।

উক্ত দু'টো বিষয়ের দরুন হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। যখন মানুষ খোদাতাআলার তওহীদকে প্রত্যক্ষ্যভাবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বীকার করে এবং এর ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে মহত্ব তার ভাগ্যে ঘটে যা কেবল তাঁর একনিষ্ঠ দাসগণই পেয়ে থাকেন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বা তাদের অন্তর থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ্' প্রস্ফুটিত হয়। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে"-এ বাক্যে দু'টি দিক নিহিত আছে। এক, নিজের সত্তার দিকে যেন বান্দার দৃষ্টি না যায়-এই খেয়াল যেন না হয় যে, আহা! আমিও

আঁ হযরত (সঃ) রমযানের শেষ দশকে অত্যধিক মুজাহাদা (সাধনা) করতেন, এতো যে ঐ দিনগুলো ব্যতীত অন্যান্য দিনে ততো মুজাহাদা করতেন না। অতএব, এর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী আহমদীদের উদ্দেশ্যে আমার নসীহত হলো, গাফিলতি যদি আগে হয়ে থাকে তা পরিহার করুন এবং এখন এই দশকের মুজাহাদায় আত্মনিয়োগের জন্যে নিজেরা তৈরী হয়ে নিন।

বড় কিছু হয়ে গেলাম। তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিকার হবে 'আলহামদ'-এর দ্বারা 'না, না, প্রশংসারাজী তো কেবল আল্লাহ্‌রই। আমরা তাঁর কিছু খয়রাতস্বরূপ পেয়েছি; আমাদের তো মূলতঃ কিছুই নয়।' দ্বিতীয়তঃ 'আলহামদুলিল্লাহ্' গভীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন-সূচক কলেমায় বা প্রবচনে পরিণত হয়েছে। আঁ হযরত (সঃ)-এর সময় থেকে চলে আসছে যে, যখন ভাল কোন সংবাদ পাওয়া যায় তখন মুখ থেকে অবলীলায় 'আলহামদুলিল্লাহ্' নিঃসৃত হয়। কাজেই, উল্লেখিত উভয় অর্থে 'আলহামদু লিল্লাহ্'র আবৃত্তি এ দিনগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

আরেকটি হাদীস 'সহী মুসলিম, কিতাবুল ই'তিকাফ' থেকে গৃহীত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) রমযানের শেষ দশকে অত্যধিক মুজাহাদা (সাধনা) করতেন, এতো যে ঐ দিনগুলো ব্যতীত অন্যান্য দিনে ততো মুজাহাদা করতেন না। অতএব, এর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী আহমদীদের উদ্দেশ্যে আমার নসীহত হলো, গাফিলতি যদি আগে হয়ে থাকে তা পরিহার করুন এবং এখন এই দশকের মুজাহাদায় আত্মনিয়োগের জন্যে নিজেরা তৈরী হয়ে নিন।

মুসলিম,কিতাবুয যিকর্-এ আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি রয়েছে যে, (একদল সাহাবাসহ) আঁ হযরত (সঃ) কোন এক সফরে ছিলেন তখন মানুষ জোরে জোরে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকলেন, । তাতে হুযূর পাক (সঃ) বললেন, হে জনগণ! মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর, তোমরা তো কোন বধিরকে আহ্বান করছো না এবং এমন কাউকেও না যিনি নিকটে উপস্থিত নন। তোমারা বস্তুতঃ আহ্বান করছো তাঁকে, যিনি 'সামী' (সর্বশ্রোতা) এবং তাঁকে যিনি হচ্ছেন ক্বারীব' (নিকটে উপস্থিত)।" এখন এই উপদেশটি থেকে আমরা ঐশী নৈকট্যের অর্থও জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-এর পাশাপাশি, তাঁর সাহাবাদেরও নিকটে ছিলেন। অনেক বড় ধরনের সুসংবাদ এটা সাহাবাদের জন্যে। তাঁরা তাঁকে ডাকছেন যিনি হচ্ছেন তাদের নিকটে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ও ছিলেন নিকটে, যাঁর মাঝে আল্লাহ্ ছিলেন বিরাজিত। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর মাধ্যমে, তাঁর কল্যাণ প্রসাদে সাহাবাগণও ছিলেন খোদার নিকটে এবং তাদের মধ্যেও খোদা আলোকসম্পাত করেছিলেন। অতএব আল্লাহ্ যেহেতু সর্বশ্রোতা এবং ক্বরীব (নিকটে উপস্থিত), সেহেতু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ডাকো। উঁচু আওয়াজে তাঁকে ডাকা জরুরী নয়। কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন কিন্তু খোদাকে শোনাবার জন্যে নয়, বরং এরূপ মানুষদের শোনাবার জন্যে, যাদের ওপর তকবীরের প্রতাপ ও প্রভাব আরোপ করা আবশ্যকীয় ছিল। অতএব, ওরূপ ক্ষেত্রে তকবীর ধ্বনি সজোরে উচ্চারিত হয় তাদেরকে শোনাবার উদ্দেশ্যে যারা হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের প্রতি বধির-স্বরূপ, যাতে তকবীরের ছোঁয়া তাদের হৃদয়ে লাগলে তাদের সুপ্ত হৃদয় জেগে ওঠে। হয়ত এর কষাঘাতে আল্লাহ্‌তাআলার যিক্‌র তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

'বুখারী, কিতাবুস সওম', হযরত আয়েশা

(রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, যখন রমযান শেষ দশকে প্রবেশ করতো বা শেষ দশক শুরু হতো, তখন আঁ হযরত (সঃ) কোমর বেঁধে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাঁর রাতগুলোকে জীবিত করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও ইবাদতের জন্যে জাগাতেন।" পরিবার-পরিজনকে জাগানো তো তাঁর সব সময়ের সাধারণ রীতি ছিল এবং তাঁর রাত্রিগুলোও (ইবাদতে) জীবিত-ই থাকতো। এই হাদীস থেকে অধিকতর চেষ্টা-প্রয়াস এবং অধিকতর মনোনিবেশ প্রমাণিত হয়। অতএব, **যারা আগে থেকে তাহাজ্জুদগুজার রয়েছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই দশ রাতের তাহাজ্জুদের মধ্যে নূতন কোন বৈশিষ্টের সৃষ্টি হওয়া উচিত যা, তাদের পূর্বে আদায়কৃত তাহাজ্জুদে ছিল না।** কেননা, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামাযে যাবতীয় এ রকম বৈশিষ্ট্যই ছিল তা সত্ত্বেও তিনি (সঃ) ঐ রাতগুলোতে বিশেষ সাধনা করতেন এবং এ কারণে খোদাতাআলার এই ওয়াদা যে, 'ইন্নি ক্বরীব' তা হচ্ছে নিকটে হওয়া সত্ত্বেও আরও নিকটে হবার ওয়াদা। এর কী অর্থ? এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনন্ত-অসীম। এই ধারণা মন থেকে বের করে দেয়া উচিত যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে হয়ে গিয়েছি, এ-ই যথেষ্ট হয়েছে।' রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আল্লাহ্‌র এরূপ নিকট হননি যে, এর পরে আরও নিকটে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। সেরূপ যদি হতো তাহলে আ হযরত (সঃ)-ও স্থবির এবং খোদাও স্থবির হয়ে যেতেন। অথচ যে খোদা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর আলোক-সম্পাত করেছেন সে-খোদা কখনও স্থবির নন, একই জায়গায় তিনি থেমে নন। নৈকট্যেও তিনি অগ্রসর হয়ে থাকেন। আর মানুষ যখন ভাবে যে, এর চে' বেশি নৈকট্য কি সম্ভব নয় তখন সে আরও নৈকট্যের দৃশ্য অবলোকন করে থাকে। বস্তুতঃ আঁ হযরত (সঃ) এহেন নৈকট্যে সদা অগ্রসরমান থাকেন। কেউ বলতে পারেনা যে, নৈকট্যে কোনও মার্গে পৌছার পর তিনি সেখানে থেমে গিয়েছিলেন। অতএব, সেজন্যেই আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-কে অধিকতর নৈকট্যের ওয়াদা দিতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অন্যান্য যতো তাহাজ্জুদগুজার ও খোদার পথের সন্ধানী যারা রয়েছেন তাদের জন্যে এ বিষয়টিতে বড় ধরনের উপদেশ নিহিত রয়েছে, তারা যেন ঐশী নৈকট্য সন্ধানে আরও সচেষ্ট হন।

কোনও এক পর্যায়ের নৈকট্যের কথা ভেবে সেখানে থেমে যাওয়া যথেষ্ট নয়। এটা পার্থিব প্রেমিকদের কাজ যে, তারা পরস্পর ঘনিষ্ট হতে হতে কোন এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। আর যেখানে থেমে যায় সেখান থেকেই তাদের প্রেম মরতে শুরু করে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র প্রেম চিরস্থায়ী, এবং তাঁর নৈকট্যের পথে এমন কোন মার্গ নেই যেখানে আপনারা থেমে যাবেন আর তখনই প্রেম মৃয়মাণ হতে শুরু করবে। সুতরাং এই সব বিষয়-বস্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর এ সুন্নতটির অন্তর্ভূক্ত যে, (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথে) তিনি তাঁর কোমর বেঁধে আত্ম-নিয়োজিত হতেন। যেমন কেউ পরিশ্রমের কাজের জন্যে তাঁর কোমর বন্ধন কষে বেঁধে নেয়। এটাকেই আরবী ভাষার বাগধারায় কোমর বেঁধে নেওয়া বলা হয়। অতএব আঁ হযরত (সঃ)-ও ওরূপই কোমর কষে বেঁধে নিতেন। (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সদা অধিকতর অগ্রসরমান হবার উদ্দেশ্যে)।

এটা পার্থিব প্রেমিকদের কাজ যে, তারা পরস্পর ঘনিষ্ট হতে হতে কোন এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। আর যেখানে থেমে যায় সেখান থেকেই তাদের প্রেম মরতে শুরু করে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র প্রেম চিরস্থায়ী, এবং তাঁর নৈকট্যের পথে এমন কোন মার্গ নেই যেখানে আপনারা থেমে যাবেন আর তখনই প্রেম মৃয়মাণ হতে শুরু করবে।

তাঁর ই'তেকাফে বসার যদ্দুর সম্পর্ক সে-প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি আমাদের পথপ্রদর্শন করছে। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল থেকে গৃহীত, রমযানের শেষ দশকে তিনি (সঃ) ই'তেকাফ করেন। তাঁর জন্য খেজুরের শুকনো ডাল-পাতা দিয়ে হুজরা (কক্ষ) নির্মাণ করা হয়। স্মরণ রাখবেন যে, ঐ যুগে মসজিদ-নববী আয়াতনের দিক দিয়ে এতো বড় বিস্তৃত ছিল যে, বর্তমানকালের মসজিদগুলোতে আপনারা তা ভাবতেও পারেন না। অনেক বিশাল ব্যাপক মসজিদ-নববী। সেখানে জায়গায় জায়গায় পৃথক তাঁবু স্থাপন করা হতো। আলাদা আলাদা হুজরা তৈরী করা হতো এবং সাধারণতঃ একজনের আওয়াজ আরেকজনের নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটাবার কারণ হতো না। এ-ই চলমান রীতি ছিল।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (সঃ) কক্ষের বাইরে উকি দিয়ে বললেন, এখন সকল ই'তেকাফকারী মনোযোগ দিয়ে শুনে নিন। তিনি কী বললেন, নামাযী তার প্রতিপালক প্রভুর কাছে আকুতি-মিনতি এবং প্রেম নিবেদনে আত্মমগ্ন হয়ে থাকে সেজন্যে জরুরী, একে অন্যকে শোনাবার উদ্দেশ্যে 'কিরায়াত বিল জাহ্‌র, (উঁচু কণ্ঠে তিলাওয়াত) করো না। হাদীসটির ভাষ্য হচ্ছে "লা ইয়াহ্‌জার বা'যুকুম আলা বা'যিন বিল কিরয়াতি" অর্থাৎ এর দু'টো অর্থ করা যেতে পারে-'নিজের কিরায়াতের দ্বারা আরেকজনের কিরায়াতে যেন ব্যাঘাত না ঘটায়'। আরেকটি প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্যে'। তবে সাধারণতঃ ই'তেকাফে বসার যে রীতি রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কখনও শুনি নি যে, কেউ তার কোন হুজরায় বসে আন্য কাউকে শোনাবার জন্যে কুরআন পাঠ করে। এ তো কোন কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কিন্তু অপরদিকটি-ই সঠিক যে, যদি কেউ উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করে তাহলে সে অন্যের তিলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে। আর এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাগ্রচিত্তে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার রাত। তাতে কারো এই অধিকার নেই যে, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাই হোক না কেন নিবিড় চিত্ততার এই নির্জন মুহূর্তগুলোতে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে তাঁর তাঁবু থেকে বের হয়ে এ কথাটি বললেন তাতে দুটি বিষয় সুনিশ্চিত। এক, আঁ হযরত (সঃ)-এর কিরয়াতের আওয়াজ অন্যান্য তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছাত না। যদি পৌছত তাহলে ঐ নসিহত তিনি করতেই পারতেন না। কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর চেয়ে বেশি ভালবাসা আর কার-ই বা হতে পারে? তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ তো তাঁবুর আওতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

থাকে আর অন্য কোনও তাঁবুর আওতায় ব্যাঘাৎ সৃষ্টি করে না কিন্তু অন্যদের আওয়াজ এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে-তা তখনই সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর তাঁবু পর্যন্ত আওয়াজ এসে পৌঁছুতো। সুতরাং তিনি তা শ্রবণ করেন এবং অপসন্দ করেন এবং অন্যান্যদের জন্যেও এইসূত্রে এক রকম নিরাপত্তার বিধান করেন যে, প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার রয়েছে আল্লাহ্তাআলার সঙ্গে নির্জন নিবিড় চিত্ততার ব্যাপারে সে যেন পৃথক এবং গোপন থাকে। অন্য কেউ যেন তার ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ না হয়। উল্লেখিত বিষয়টি যেন আমাদের মু'তাকেফীন দৃষ্টিপটে রাখেন। অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে যে, তাঁরা তাদের ইবাদত করার সময়ে, গিরিয়াযারির সময়ে অথবা তিলাওয়াত করার সময়ে এসব কথা ভুলে যান আর এর ফলে সব সময় আপত্তির সৃষ্টি হতে থাকে।

এখন, একটি হাদীস 'আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত' থেকে নেয়া হয়েছে। হযরত ফাযালা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, আঁ হযরত (সঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শ্রবণ করলেন, সে আল্লাহ্তাআলার হাম্‌দ ও সানা করেনি এবং নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি দুরূদও পাঠায় নি। অতএব, যারা তাদের দোয়াসমূহকে মকবুল (গ্রহণযোগ্য) করে তুলতে চান তাঁরা এই নসীহতটি মনোযোগ সহকারে শুনে নিন যে, রমযানের দোয়াসমূহ গৃহীততো হবে কিন্তু আগে তসবীহ্, তাহ্মীদ ও দুরূদ পাঠ করা আবশ্যকীয়। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, সে তাড়াহুড়া করেছে অর্থাৎ ত্বরিৎ সে তার ঈপ্সিত কথায় চলে এসেছে এবং ভুলে গেছে যে, যে পথ ধরে তার স্বার্থের কথা বলা উচিত ছিল যার দরুন সে সফলকাম হতে পারতো তা সে অবলম্বন করতে বিস্মৃত হয়েছে। সে Short cut করে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছবার চেষ্টা করেছে। শর্ট করতে গিয়ে মানুষ কোন সময় আবার পদস্খলিত হয়ে থাকে, উদ্দেশ্য হাসিলেই ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা ধারা ও কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তোমরা যদি নিজেদের দোয়াকে কবূল করাতে চাও তাহলে এই পদ্ধতি অবলম্বন কর। সে পদ্ধতিটি কী? তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা সে ব্যতীক অন্য কাউকে বললেন তবে সে-ও শ্রবণ করছিল, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দোয়া চায় তখন সে যেন তার প্রভু আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা করে। এতদ্ব্যতীত কখনও যেন সে দোয়া না চায়। তারপর নবী করীম (সঃ)-এর ওপর যেন দুরূদ পাঠায়।" হাদীসটির ভাষ্য হচ্ছে- "সুম্মা ইউসাল্লি আলান নাবীয়ে" আর সেই সঙ্গে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"-ও বলেন। এখানে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে পৃথক করে আমাদের উদ্দেশ্যে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম" শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেন। আসল রিওয়ায়াতে হুবহু ওরূপেই লিপিবদ্ধ আছে। তারপর বলেন "সুম্মা ইয়াদউ বা'দু মা শা'য়া-এর পর যা ইচ্ছা দোয়া করুক। "যো দোয়া কিজিয়ে কবুল হ্যয় আজ" ধরনের ব্যাপারে হবে। তখন যে দোয়াই করা হোক তা গ্রহণযোগ্য দোয়া হবে।

এ বিষয়টি স্মরণ রাখবেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের রূহ সিজদাবনত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়াসমূহ কবুল হবে না।

আঁ হযরত (সঃ) দোয়ার কবুলিয়ত সম্পর্কিত বিশেষ একটি মওকার কথা উল্লেখ করেছেন যখন দোয়া বেশি কবুল হয়ে থাকে। সে মওকাটি কী তা হচ্ছে সিজদার অবস্থা। 'মুসলিম কিতাবুস সালাতে' হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, মানুষ তার প্রতিপালক প্রভুর সবচে' নিকটে হয় তখন, যখন সে সিজদায় থাকে সেজন্যে তখন অনেক দোয়া করো (মুসলিম কিতাবুস সালাত বাবু মা ইয়াকুলু ফিররুকূয়ে ওয়াস সাজুদ)।

এখন, এ হাদীসটি অন্যান্য কোন কোন হাদীসের সাথে আপাতঃ দৃষ্টে এক বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। হযরত আয়েশা ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং সাহাবাগণ বর্ণিত কতিপয় রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রায় সারা রাত খোদার সমীপে দন্ডায়মান অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন, এমন কি তাঁর পা ফুলে যেতো। এখন, সিজদার অবস্থা এবং কিয়াম বা দন্ডায়মান অবস্থার মাঝে এ প্রসঙ্গে পার্থক্য কী? তা আমি বোঝাতে চাই যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রকৃতপক্ষে তখনও সিজদার অবস্থাতেই হতেন। আসল সিজদা হচ্ছে রূহের সিজদা। বাহ্যিক সিজদাও ঐশী নৈকট্যের এক প্রতীকি চিহ্নস্বরূপ হয়ে যায়। তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সিজদাগুলোও সুদীর্ঘ হবারও উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেশির ভাগ বর্ণনায় রাত্রিকালে সুদীর্ঘ কিয়ামের উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায়। অতএব, এই ধরণা গ্রহণ করা যে, সিজদা একটি পৃথক অবস্থা ছিল এবং কিয়াম ভিন্ন এক অবস্থা ছিল তা এজন্যে সঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আত্মা বা রূহ কখনও সিজদা থেকে পৃথক হয়নি। সুতরাং তাঁর রূহ্ সিজদাবনত থাকতো যদিও কিনা দেহ দন্ডায়মানই হতো। আর তিনি (সঃ) বলেছেন, সিজদার অবস্থায় আল্লাহ্ নিকটতর হয়ে থাকেন। অতএব, আল্লাহ্ তাঁর (সঃ) অধিকতর নিকটে ছিলেন। যদিও বা নামাযে তিনি দন্ডায়মান অবস্থায় থাকুন অথবা বাহ্যিকভাবে সিজদারতই হোন। অতএব, এ বিষয়টি স্মরণ রাখবেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের রূহ সিজদাবনত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়াসমূহ কবুল হবে না। দোয়া কবুল হবার আরেকটি পদ্ধতি আঁ হযরত (সঃ) বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে বর্তমান দিনকালের আগেই বর্তমান দিনকালের প্রস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আজ আমরা চাই যেন আমাদের দোয়া কবুল হয়। আর তেমনি বিপদ-মসিবতের সময় আমরা চাই আমাদের দোয়া যেন কবুল হয়। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "যখন সচ্ছলতার দিন থাকে-যখন তোমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন বা অভাব অনটন থাকে না, তখন আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হও এবং মুনাজাত করো। তাহলে এরূপ কখনও হতে পারে না যে, তোমাদের প্রয়োজনের সময়ে আল্লাহ্ তোমাদের ভুলে যান।" অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দিনগুলো (রমযানের শেষ দশক) বিশেষ কবুলিয়তের দিন-স্বরূপ এবং ঐশী নৈকট্যের দিন-স্বরূপ এজন্যে ছিল যে, তাঁর সাধারণ দিনকালও তদ্রূপই ছিল। কখনও তাঁর ওপর এরূপ কোন অবকাশের দিন আসে নি যখন তিনি কিনা আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অমনোযোগী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ প্রয়োজন পড়ার আগেই প্রয়োজনগুলোর জন্যে তিনি দোয়া করে থাকতেন। আর সুন্নতটি তাঁর এতোই সুমহান যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্যে কিয়ামতকাল অবধি সম্ভাব্য

যা প্রয়োজন অসন্ন ছিল, কল্পনার চোখে সেগুলোর বিবেচনা করেই রসূলুল্লহ্ (সঃ) তজ্জন্যে দোয়া করে নেন।

কাজেই সে খোদা তাঁর দোয়াসমূহ কী করে অগ্রাহ্য করতে পারেন? যখন কিনা তিনি সেগুলোর কোনও প্রয়োজন পড়ার বা দেখা দেয়ার আগেই সেগুলোর জন্যে দোয়া শুরু করে রাখেন। অতএব, যখনই প্রয়োজন দেখা দিবে তখনই এই মহান বান্দা তাঁর আল্লাহ্‌কে তাঁর নিকটে পাবেন, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকটে তো তিনি বিদ্যমানই থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁকে নিকটে প্রত্যক্ষ করে থাকি। অর্থাৎ বড়ই অদ্ভুত বিস্ময়কর বিষয়বস্তু যে, চৌদ্দশ' বছর পরও আঁ হযরত (সঃ)-এর দোয়া এমন ধারায় কবুল হচ্ছে যে, আমরা খোদাকে নিকটে দেখতে পারছি। কিন্তু নিকটে হয়ে থাকেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আর ঐ নৈকট্যের দৃশ্যাবলীই আমরা অবলোকন করে থাকি। অতএব, সচ্ছলতা ও আরামের সময়ে আপনারাও এ পদ্ধতিটিই রপ্ত করুন। ঐ দোয়াগুলো করবেন যা দুটো দিকসম্পন্ন। একটি এই যে, সচ্ছলতা থাক, আরাম বিরাজ করুক এবং আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন না থাক তবুও যেন আল্লাহ্‌র আবশ্যকতা থাকে। এই যে আল্লাহ্‌কে আমাদের প্রয়োজনের বিষয়টি তো এই আয়াতে করীমায় অন্তর্নিহিত রয়েছে, যা আমি পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি- "যখন সে আমাকে ডাকে।" প্রয়োজন পূরণের সেখানে উল্লেখ নেই-একথা বলেন নি, 'আমাকে প্রয়োজন পূরণের জন্যে ডাক' বরং বলেছেন, "আমাকে অন্বেষণ করতে থাকুক, আমাকে ডাকতে থাকুক-আমি যেন তাদের কাম্য হই। যদি তা-ই হয় তাহলে এই সাধারণ দিনগুলোতে যখন কিনা খোদার কাছে চাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না তখনও খোদার অন্বেষণ বিদ্যমান থাকা উচিত। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই সকল বিষয় বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, সচ্ছলতা ও আরামের সময়ে যখন প্রয়োজনের খাতিরে তোমাদের খোদা স্মরণে না আসেন, তখন খোদার খাতিরে যেন খোদা তোমাদের স্মরণে আসেন। তখনও যদি খোদাকে তোমরা ডাকতে থাক, তাহলে তোমাদের প্রত্যেক বিপদে ও সংকটে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

অতঃপর হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস যা 'বুখারী, কিতাবুদ দায়ওয়াত বাব ফযলু যিকরিল্লিাহ্' থেকে গৃহীত। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "যে তাঁর প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ করে তাঁর 'যিকর' করে এবং যে করে না এতদোভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" অতএব, তোমাদের উচিত যেন জীবিত হও এবং তোমাদের জীবন যেন যিকরে ইলাহীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এমনি তো দুনিয়াতে চল ফির, পানাহার কর। যে অস্থায়ী জীবনকাল এখানে নির্ধারিত আছে তা তোমরা পাবে-হয়ত তা সচ্ছলভাবে কেটে যাবে, না হয় দুঃখে-কষ্টে যেমন কিনা তোমাদের ভাগ্যে রয়েছে তারপর মরে যাবে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ হতে জীবন পায় সে (আসলে) আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিকরের দ্বারা জীবিত হয়, সে মরে না। এ বিষয়-বস্তুই প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে। নইলে, বলতে পার, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করল সে-ও মরে গেল আর যে করল না সে-ও মারা গেল। যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করেছে সে

সচ্ছলতা ও আরামের সময়ে যখন প্রয়োজনের খাতিরে তোমাদের খোদা স্মরণে না আসেন, তখন খোদার খাতিরে যেন খোদা তোমাদের স্মরণে আসেন। তখনও যদি খোদাকে তোমরা ডাকতে থাক, তাহলে তোমাদের প্রত্যেক বিপদে ও সংকটে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

কখনও মরে না, কেননা, আল্লাহ্ কখনও মারা যান না। কাজেই আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দরুন সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জীবন পেয়ে যায়, যা ইহকালীন জীবনের সাথেও সম্পর্কযুক্ত এবং পরকালীন জীবনের সাথেও। সহী মুসলিমে উক্ত বিষয়েরই আরেকটি হাদীস নিম্নরূপঃ তিনি (সঃ) বলেন, যে গৃহে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় এবং যে গৃহে করা হয় না এতদোভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (মুসলিম কিতাবুস সালাত, বাব ইস্তেজাবু সালাতিল্ নাফেলাতে ফি বায়তিহি ওয়া জাওয়াযিহা ফিল মাসজিদে)। এ হাদীসটি আমাদেরকে এ বিষয়ে মনোযোগী ও সচেতন করে তোলে যে, একটি গৃহে বসবাস করে যদি কিছু পরিবার-সদস্য মৃতবৎ হয় যারা যিকরে ইলাহী করে না-তাঁকে স্মরণ করে না, তাহলে যারা যিকরে ইলাহী করে তাদের ফয়েয ও কল্যাণকর প্রভাব ঐ মৃতবৎদের পৌঁছতে ও পড়তে পারে। তাতে ঐ ঘরকে আল্লাহ্ জীবিত করে দিবেন। অতএব, অন্যেরাও যারা সেখানে থাকবে তারাও কিছু কল্যাণ ও ফয়েয পেতে পারে। কাজেই বিশেষতঃ ঐ সকল লোক যাদের সন্তানদের মাঝে, যাদের পরিজন ও আত্মীয়দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বিমুখ লোক রয়েছে, তারা এ হাদীসটি দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের গৃহের সঞ্জীবনের উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ্‌র যিকরের দ্বারা সারা ঘর জীবিত হয়ে যায়। কেবল তাদের নিজেদের পর্যন্তই তা সীমিত না থাকে।

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গেই আমি সমগ্র জামাতের সমীপে দোয়ার জন্য অনুরোধ করে এসেছি। এদিনগুলোতে বিশেষরূপে দোয়া হওয়া উচিত এবং এই দোয়ার যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা আঁ হযরত (সঃ)-এর এই সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যা হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, উমরার জন্যে আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করলেন আর সেই সাথে বললেন, "হে আমার ভাই! আমাদেরকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না।" উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা ছিলেন তিনি, যিনি সমস্ত জাহানের জন্য দোয়া করতে থাকেন আজীবন, পূর্ববর্তীদের জন্যও এবং পরবর্তীদের জন্যও এবং কিয়ামতকাল অবধি যাঁর দোয়াসমূহ হচ্ছে আমাদের পুঁজি, তাঁর বিনয়ের মোকাম ও মর্যাদা লক্ষ্য করুন, তাঁর অমায়িকতা দেখুন। হযরত উমরকে (রাঃ) বলেন, হে আমার ভাই! নিজের দোয়াতে আমাদের কথা ভুলে যেওনা। হযরত উমর (রাঃ) ঐ মহান ব্যক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতেন। তাই যখন তাঁকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তা বলেন তখন হযরত উমর (রাঃ) বলছেন, 'হুযূরের সে কথায় আমি নিজেকে এতো আনন্দিত বোধ করি যে, এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়া আমি পেয়ে যাই তবুও ততোটা আনন্দ বোধ করবো না।' তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)।

দোয়ার জন্যে বলাতে তিনি এজন্যই খুশী হয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উমর

(রাঃ)-কে নিজের জন্য দোয়ার ঐ যে সনদ প্রদান করলেন তা থেকে তিনি দোয়ার কবুলিয়তের সুসংবাদ পেয়ে যান। যদি হযরত উমরের দোয়া কবুল হবার বিষয়ে এবং যে খাঁটি নিয়্যত ও নিষ্ঠার সঙ্গে হযরত উমর (রাঃ) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন সে সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেয়াল না হতো, তাহলে কখনও তিনি (সঃ) উমরের (রাঃ)-কে নিজের জন্যে দোয়ার কথা বলতেন না। হযরত উমরের (রাঃ) তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও লক্ষ্য করুন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যেমন আল্লহ্‌র তত্ত্ব-পরিচিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন তেমনি আল্লাহ্‌র এই মহান বান্দা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা হযরত উমরও (রাঃ) জানতেন। এ কারণেই তিনি খুশী হন। নইলে প্রত্যেকে বলবে, 'দেখো! আমাকে দোয়ার জন্য বলেছেন, আমি তাতে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।' সে তার মধ্যে অহমিকার দরুনই খুশী হচ্ছে। পক্ষান্তরে হযরত উমরের মধ্যে কোন অহমিকা ছিল না–রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে দোয়ার জন্য বলাতে স্ফীত হয়ে তিনি খুশী হচ্ছিলেন না। বরং খুশী এজন্যে হচ্ছিলেন যেমন আগেই আমি বর্ণনা করেছি যে, তিনি (রাঃ) জানতেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দোয়ার জন্য বলায় একটি সুসংবাদ নিহিত ছিল যে, তাঁর (রাঃ) দোয়া কবুল হবে, এর মোকাবেলায় যদি সমস্ত দুনিয়া পেতেন তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

এখন, লাইলাতুল-কদরও হয়ত এদিনগুলোতেই আসবে। আল্লাহ্ ভাল জানেন কে এর সৌভাগ্য পাবে আর কে পাবে না। কিন্তু যারই এ সৌভাগ্য লাভ হয় অথবা অন্ততঃ যার এই ধারণা থাকে যে, এই লাইলাতুল কদর পাবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটবে তাঁর পক্ষে আঁ হযরত (সঃ)-এর ঐ দোয়াটি কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যা কিনা লায়লাতুল-কদরের দোয়াসমূহের প্রাণস্বরূপ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি জ্ঞাত হই যে, তা লাইলাতুল-কদর বটে, তাহলে সে মুহূর্তে আমি কি দোয়া চাইব? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, তখন এই দোয়া করো; **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউয়্যুন, তুহিব্বুল আফ্ওয়া, ফা'ফু আন্নি"** (জামে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)। –হে আমার আল্লাহ্! তুমি অত্যন্ত মার্জনাশীল, অত্যন্ত উপেক্ষাকারী, "তুহিব্বুল আফ্ওয়া" এবং উপেক্ষা করাই তুমি পসন্দ কর, "ফা'ফু আন্নি"–অতএব আমার ক্ষেত্রে উপেক্ষা কর (এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আমাকে দেখ)। তরজমাকারীগণ তরজমা করেছেন, আমাদেরকে বখশে দাও, ক্ষমা কর। অথচ "আফুউয়্যুন"–এর অর্থ এখানে ক্ষমা করা বা বখশে দেয়া নয়। তা এর আগের স্তর। যদি তা পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে তা হলে অবলীলায় সে-ব্যক্তি ক্ষমাই পেয়ে গেল। 'আফুউয়্যুন' দ্বারা বুঝায় যে, আমাদের তথা সমস্ত মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষাকারী এবং তাঁর (প্রিয়) বান্দাদের দুর্বলতাগুলোও তিনি উপেক্ষা ও মার্জনা করে থাকেন। যখন উপেক্ষা করা হয় তখন দুর্বলতা যেন আর থাকেই না-মার্জনা করে দেয়া হয়। অতএব ক্ষমার পূর্ববর্তী স্তর হচ্ছে'আফ্উ"-এর স্তরটি। যদি 'আফ্উ'-এর সৌভাগ্য লাভ হয় তাহলে ক্ষমা বা 'বখশিশ' যেন এমনিতেই লাভ হল 'আফ্উ'-এর কল্যাণেই।

সুতরাং এখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) 'ফাগ্‌ফিরলি'-এর দোয়া শিখান নি। তা এজন্যেই যে, ক্ষমা প্রদর্শন ব্যতিরেকেই 'আফ্উ' মূলতঃ পরিপূর্ণ এবং প্রথম ও প্রধান স্থানবিশিষ্ট, যদি আল্লাহ্‌তাআলা আজীবন স্বীয় বান্দাদের সাথে 'আফ্উ' সুলভ ব্যবহার করেন এবং তার পাপসমূহ উপেক্ষা করতে থাকেন তাহলে এর ফলাফল কী হতে পারে? দু'টি ফল হতে পারে। একটি ভাল আর একটি মন্দ। ভাল ফলটি তো এই যে, 'আফ্উ'-এর ফলশ্রুতিতে মানুষের অন্তরে তাঁর সম্বন্ধে মাহাত্ম্যবোধ এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রতিনিয়তঃ সে চেষ্টা করে যেন এমন মওকা না আসে যখন তিনি আমার গুনাহ্‌র কারণে আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আরম্ভ করেন-মন্দ চোখে আমাকে দেখেন। এ সেই ফল, যার দিকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের মনোযোগী করেছেন এবং লাইলাতুল-কদরের দোয়ার ক্ষেত্রে এরচে' উত্তম ও অধিকতর দোয়া আর কী হতে পারে? অপর ফলটি হতে পারে পাপের আস্পর্ধা। আপনারা বাড়ীতে শিশু সন্তানদেরকে তাদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কখনও যদি শাসন না করেন, সবসময় যদি উপেক্ষা করতে থাকেন তাহলে মন্দ কাজে তাদের আস্পর্ধা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কাজেই আঁ হযরত (সঃ) লাইলাতুল কদরের সময় গুনাহ্‌র আস্পর্ধার দোয়া তো অবশ্যই শিখাচ্ছিলেন না। সেজন্যই, এ দোয়াটিতে সে অর্থই নিহিত যা আমি বর্ণনা করেছি। এ দিক দিয়ে 'আফ্উ' গুফ্‌রানের উর্ধ্বতন স্থান বটে। অর্থাৎ যখনই খোদা 'আফ্উ' সুলভ ব্যবহার করেন তখন সহসা আপনাদের মনোযোগ সে দিকে নিবদ্ধ হোক। অনেক সময় মানুষ ঠাহর করতে সক্ষম হয়, এবং ভুল করার সময় মানুষ বলে যে, আমি ভুল করছি। তখন সহসা খেয়াল হয় যে, আরে! একজন যে খোদা আছেন তিনি আমাকে প্রত্যক্ষ করেছেন আর তখন অন্তর থেকে দোয়া নির্গত হয়, তিনি যেন উপেক্ষা করেন। এরপর যখনই ভুল সংঘঠিত হতে যাবে, এই খেয়াল তখন অন্তরে নিশ্চয় জেগে উঠবে।

তারপর, এ খেয়ালও তো জাগ্রত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টি কল্যাণ থেকে আমি কেন-ই বা এক মুহূর্তও পৃথক বা বঞ্চিত থাকি। শুধু কি এজন্য যে, আমি দুর্বল এবং গুনাহ্‌তে বার বার লিপ্ত হয়ে পড়ি? এটা এই দোয়ার এক স্বভাবিক ফল-একটি যৌক্তিক পরিণতি, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ এই চায় আল্লাহ্ যেন আমাদের ওপর থেকে তাঁর সদয় দৃষ্টি আর কখনও না সরান, অর্থাৎ গুনাহ্‌র দরুন তাঁর দৃষ্টি না ফিরান তা নয় বরং গুনাহ্ করার ক্ষমতা অর্থাৎ গুনাহ্ করার সাহসই যেন আমাদের রহিত হয়ে যায়। তারপর আমরা যেন খোদার সদয় দৃষ্টি আমাদের ওপরে এরূপে পড়তে অবলোকন করি যে, তিনি যেন সম্পূর্ণ সুদৃষ্টিতে আমাদের দেখেন এটা 'আফ্উ' বিরোধী নয়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই দোয়া করেন যে, "প্রত্যেক অবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আমায় দেখছেন, আল্লাহ্ আমায় দেখছেন–"সুবহানা মাইঁ ইয়ারানী"–'পবিত্র তিনি, যিনি সদা আমায় দেখেন,' এর অর্থ এই যে, আমি তো আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজের অন্তঃকরণকে মেজে-ঘষে এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি এবং আল্লাহ্ ও আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করেন যে, যদি কোন ত্রুটি অবশিষ্ট থেকেও যায় তাহলে তিনি (মার্জনা সুন্দর দৃষ্টিতে) তা উপেক্ষা করেন। এমনকি, এখন আমি এই আকাঙ্ক্ষা রাখি যে, প্রত্যেক অবস্থায়, সব দিক দিয়ে আমার অভ্যন্তরের সর্বত্র খোদাতাআলা যেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন এবং সর্বদা আমাকে হিফাযত করতে থাকেন।

অতএব হাদীস বর্ণিত এ সেই দোয়া, যা (এই রাতগুলোতে) চাওয়ার সময় উল্লেখিত বিষয়-

বস্তুটি অবশ্যই দৃষ্টিপটে রাখুন। অন্যথায়, যদি এই দোয়া চাওয়া হয় যে, হে খোদা! আমরা গুনাহ্ করতে থাকি আর তুমি তা উপেক্ষা করতে থাকো; তাহলে তা গুনাহ্র আস্পর্ধা উদ্রেকের কারণ হবে। গুনাহ্র প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করবে না। অতএব, এখন উক্ত বিষয়বস্তুটি দৃষ্টিপটে রেখে আমি দোয়াটির পুনরাবৃত্তি করছি। আরবি শব্দ যদি মনে না থাকে তাহলে এর অর্থ বিষয়বস্তু স্মরণ রেখে দোয়াটি করতে থাকুন।"হে আমার আল্লাহ্! তুমি 'আফ্উ'-কারী "ইন্নাকা আফুউয়্যুন।" এর আসল অর্থ, পরিপুর্ণ 'আফ্উ'। 'তুহিব্বুল আফ্-ওয়া'-'আফ্উ'-কে ভালবাস, পসন্দ কর। "ফা'ফু আন্নি" অতএব তুমি আমার প্রতিও 'আফ্উ' কর (অর্থাৎ সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপে আমার দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা কর এবং সেগুলো সম্পূর্ণ দূর করে আমার প্রতি সর্বদা তোমার পরিপুর্ণ প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। সদা আমাকে হিফাযত কর। উক্ত সব বিষয়-ই 'আফ্উ'-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত-অনুবাদক)এই দোয়াটি যে অর্থে আমি বর্ণনা করেছি যদি আপনারা তা সেভাবে করেন তাহলে এই দোয়াতে আমাদেরকেও স্মরণ রাখবেন। সমগ্র জামাতকে তাতে শামিল রাখুন এবং সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দোয়ার অন্তর্ভুক্ত করুন। কেননা আমরা চাই এই রমযানের ফয়েয দ্বারা আহমদীয়া জামাত যেন সমস্ত দুনিয়াকে কল্যাণমন্ডিত করে তুলতে সক্ষম হয়।

রমযানের শেষ দশকের শেষ দিকে একটি শুক্রবার আসবে যাকে মানুষে 'জুমুআতুল বিদা' বলে থাকে এবং এর সম্পর্কে আমি সবসময় বলে থাকি যে, এই শুক্রবারটিকে (প্রকৃতপক্ষে) 'জুমুআতুল ইস্তেকবাল' বলা উচিত, বিদা (বিদায়) নয়, বরং ইস্তেকবাল (সংবর্ধনাজ্ঞাপনমূলক জুমুআ) অধিকতর আগ্রহ ও আয়োজনে এর সংবর্ধনা করুন। কেননা, ওরূপ জুমুআ (এ বছর) পুনরায় আপনাদের ভাগ্যে জুটবে না। অতএব, এর ইস্তেকবাল বা সম্বর্ধনা এভাবে করুন যাতে ইহা আপনাদের কাছেই অবস্থান করে অর্থাৎ এর বরকত ও আশিসসমূহ যেন আপনাদেরই হয়ে যায়। অনেক সময় আপনারা বড় লোকদের সম্বর্ধনা দিয়ে থাকেন। তারা আসেন এবং তারপরেই চলে যান। ওটা ইস্তেকবালও এবং বিদায়ও। কিন্তু যদি এরূপ প্রিয়জনকে অভ্যর্থনা করেন যাকে নিজের ঘরেই বসিয়ে নেন, সাদরে রেখে দেন, তাকে স্বীয় অন্তর থেকে আর কখনও পৃথক সরে যেতে না দেন তাহলে এই সম্বর্ধনাটি হচ্ছে আরেক ধরনের মর্যদাপূর্ণ সম্বর্ধনা। অতএব, রমযানের শেষ দশকের আগামী জুমুআকে আমি এই অর্থে (বিদায়ের পরিবর্তে) সম্বর্ধনামূলক জুমুআ বলে অভিহিত করছি। তাই এর সম্বর্ধনা করুন এরূপে যে, আল্লাহ্তাআলা যেন আপনাদের ভালবাসা এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে আপনাদের কাছেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং রমযানের এই যাবতীয় বরকত ও আশিস যেন সারা বছর ব্যাপী আপনাদেরই হয়ে যায়।

এই দোয়াতে আমাদেরকেও স্মরণ রাখবেন। সমগ্র জামাতকে তাতে শামিল রাখুন এবং সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দোয়ার অন্তর্ভুক্ত করুন। কেননা আমরা চাই এই রমযানের ফয়েয দ্বারা আহমদীয়া জামাত যেন সমস্ত দুনিয়াকে কল্যাণমন্ডিত করে তুলতে সক্ষম হয়।

এই ভূমিকার সাথে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি সমূহ উপস্থাপন শুরু করছি। একটি উদ্ধৃতির সামান্য অংশ বর্ণনা করতে পারবো। বাকী ইন্শাআল্লাহ্ আগামী জুমুআর খুতবায়। "যখন আমার বন্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।" ইহা সেই আয়াতেরই তফসীর, যার কিছু ব্যাখ্যা আমি পূর্বে করে এসেছি। "যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, খোদার অস্তিত্বের উপর দলীল কী? তখন এর জবাব এই যে, আমি অতি নিকটে বিদ্যমান অর্থাৎ বড়ো কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, আমার অস্তিত্ব অতি নিকটতম পথে (বা পন্থায়) বোধগম্য হতে পারে এবং অত্যন্ত সহজ উপায়ে আমার অস্তিত্বের উপর দলীল নির্ণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সে দলীল এই যে, যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার প্রার্থনা শ্রবণ করি এবং স্বীয় ইলহাম (ঐশীবাণী) দ্বারা তাকে সাফল্যমন্ডিত হবার সুসংবদা দান করি।" এ অর্থটি হচ্ছে, আমি যা উপস্থাপন করেছিলাম তদ্ব্যতীত অপর একটি অর্থ। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ চাও তাহলে তোমরা নিজেরা এরূপ হয়ে যাও যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে আরম্ভ করেন। যখন সাড়া দিতে আরম্ভ করবেন তখন তোমরা আল্লাহ্র অস্তিত্বের দলিলস্বরূপ হবে। যদি তিনি তোমাদের দোয়া না শোনেন অর্থাৎ তোমরা তাঁর থেকে দূরে থাক তাহলে তোমরা আল্লাহ্তাআলার অস্তিত্বের পক্ষে কোন দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পার না। "যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার কথা শুনি এবং স্বীয় ইলহাম দ্বারা তার সফলতার বিষয়ে সুসংবাদ দেই।" এখন, স্পষ্ট যে, **যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটবর্তী হবে এই রমযানের এই দশকে, আল্লাহ্ তাকে স্বীয় নৈকট্যের দ্বারা ভূষিত করবেন, তাকে বহু রকম সুসংবাদ রোইয়া সালেহা (সত্যস্বপ্ন), কাশ্ফ (দিব্যদর্শন) ও ইলহামসমূহের মাধ্যমে দান করবেন।** যদ্বারা আমার (আল্লাহ্র) অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাসই নয়, বরং সর্বশক্তিমান হওয়াও সন্দেহাতীত বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়।" অর্থাৎ কেবল মাত্র এ উপায়েই তোমাদের বোধগম্য হবে যে, খোদা বিদ্যমান আছেন। বরং যখন তিনি তোমাদের দোয়াসমূহ শ্রবণ করবেন তখন সর্বশক্তিমান হবারও প্রমাণ দিবেন। অর্থাৎ তোমরা তাঁর নিকট যা প্রর্থনা কর তা তোমাদের দানও করেন। অতএব, কুদরত (ক্ষমতা) ব্যতিরেকে কী করে দান করতে পারেন? অতএব, এরূপে দোয়া কর যাতে তা শ্রবণ ও গ্রহণ করেন এবং তাতে তাঁর কুদরতের নিদর্শনও প্রকাশিত হয়।

"কিন্তু মানুষের উচিত যেন নিজেদের মধ্যে তাকওয়া এবং খোদাভীরুতার এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে তাদের দোয়া আমি শ্রবণ করি। আর উচিত, তারা যেন আমাতে ঈমান আনয়ন করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তার আগে তারা স্বীকার করুক যে, খোদা বিদ্যমান আছেন এবং তিনি সবরকম শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। কেননা, যে-ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে অভিজ্ঞতামূলক তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়।" অতএব, যেহেতু এ উদ্ধৃতিটি ছাড়া অন্যান্য উদ্ধৃতির জন্য এখন আর সময় নেই, সেজন্য ইন্শাআল্লাহ্ আগামী খুতবায় নতুন কোন বিষয় বস্তু শুরু করার পরিবর্তে এ বিষয়টি-ই অব্যাহত থাকবে এবং পরবর্তী উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপিত হবে। *(পুনঃপ্রকাশ)*

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

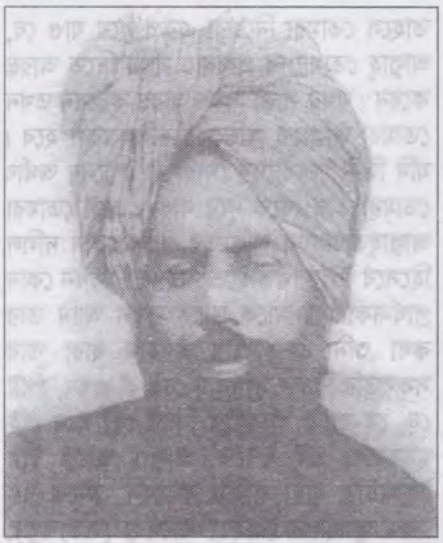

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক– হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(তৃতীয় কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ১৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রটি পেয়ে আমি কয়েকবার মনোনিবেশ পড়েছি এবং পড়ে প্রত্যেকবার আপনার জন্য দোয়া করেছি। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বিশ্বমানবকে অবাক করা তাঁর প্রতিপালন ক্ষমতায় আপনাকে দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি থেকে নিস্কৃতি দান করুন এবং তাঁর বিশেষ কৃপায় দুনিয়ায় ও দীনে সফল করুন। আমীন।

আফসোস, আমি আপনার দুঃখ-বেদনা সবিস্তারে জানতে পারলাম না এবং রোগের তীব্রতা সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত নই। যদি সমীচীন মনে করেন তাহলে অধমকে আপনার দুঃখ-কষ্ট জানিয়ে নিজ বিশ্বস্ত গোপন বন্ধু করে নিন। চাকুরী গ্রহণ করায় জনাবের পদক্ষেপ খুবই সমীচীন হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা এতেই বরকত দিন।

ইলহাম ঃ আজ ফজরের সময়ে আমার প্রতি ইলহাম স্বরূপ ইল্‌কা করা হয়ঃ 'আব্দুল বাসিত'(-প্রশস্ততা ও স্বচ্ছলতা দানকারী আল্লাহ্‌র বান্দা –অনুবাদক)। জানা ছিল না এটা কার দিকে ইঙ্গিত। আজ আপনার চিঠিতে 'আব্দুল বাসেত'-কে দেখলাম। সম্ভবত আপনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। "ওয়াল্লাহু আ'লাম" (আল্লাহ্-ই সবচেয়ে ভাল জানেন –অনুবাদক)। আমি আন্তরিকভাবে আপনার দুঃখ-বেদনায় সংবেদনশীল এবং আপনাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসি। 'ওয়ালি লিকুল্লি আমরিম মুসতাকার' (-আর প্রত্যেক বিষয়ের কাল-পাত্র ভেদে এক অবস্থান রয়েছে –অনুবাদক)। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ ইং

নোট ঃ হযরত হাকীমুল উম্মত (রাঃ) বহুবার বলেছেন যে তাঁর ইলহামী নাম হচ্ছে 'আব্দুল বাসেত'। কিন্তু কার কাছে ইলহাম হয়েছে তা তিনি কখনও খুলে বলেন নি। এ চিঠি থেকে জানা গেল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে ইলহাম যোগে তাঁর (রাঃ) নাম 'আব্দুল বাসেত' জানানো হয়েছিল। (ইরফানী)

পত্র নং ১৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিপৎপাতের তাৎপর্য ঃ

আপনার পত্র পেয়ে আমি তা কয়েকবার মনোনিবেশ পড়েছি। আমি যখন আপনার এসব দুঃখ-কষ্টের দিকে লক্ষ্য করি আর অন্য দিকে আল্লাহ্‌তাআলার সেই সব কৃপা ও মহানুভবতাপূর্ণ কুদরত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করি যা আমি নিজ সত্তায় পরীক্ষা করে দেখেছি, তখন আমি নিজেকে এতটুকুও উৎকণ্ঠিত বোধ করি না। কেননা আমি জানি যে, আমাদের মহানুভব খোদা সর্বশক্তিমান, তিনি বড় বড় বিপদ-আপদ থেকে নিস্কৃতি দান করে থাকেন। আর যার মারেফাৎ (ঐশী তত্ত্বজ্ঞান) বাড়াতে চান নিশ্চয় তার ওপর বিপদাবলী অবতীর্ণ করেন, যাতে সে জেনে যায়, তিনি নৈরাশ্য থেকে আশার সঞ্চার ঘটাতে পারেন। মোটকথা, তিনি প্রকৃত পক্ষেই কাদের ও করীম ও রহীম (মহাশক্তিশালী, মহানুভব ও বার বার কৃপাকারী) খোদা। তবে যার ক্ষেত্রে তিনি চান তার ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর অসীম কুদরত ও রহমত প্রদর্শন করেন। তবে প্রত্যেক বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মস্তিষ্কগত উপসর্গে এ অধম যে মাত্রায় আক্রান্ত সে রকম উপসর্গ আপনারও কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। আমি যখন নতুন বিয়ে করেছিলাম তখন দীর্ঘকাল অব্দি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি পৌরুষত্বহীন। অবশেষে আমি ধৈর্য ধরি এবং দোয়া করতে থাকি। তখন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু সে দোয়া কবুল করলেন। আর হৃদপিন্ডের দুর্বলতা তো এত বেশি যে তা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম। খোদাতাআলার চেয়ে উত্তম ও সর্বময় চিকিৎসক আর কেউই নয়। আমাদের সৌভাগ্য এর মাঝে নিহিত যে, আমরা যেন নিজেদেরকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও অযোগ্য বলেই জ্ঞান করি এবং সবদিক থেকে আশা ছিন্ন করে একমাত্র ঐশী আস্তানায় বিনত হয়ে অপেক্ষমান থাকি। কাজেই আপনি যদি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দেন তাহলে আমি সেই সর্বময় নিরাময়কারী আল্লাহ্‌র সমীপে আপনার নিরাময়ের জন্য নিবেদন করতে থাকবো। শর্ত এটাই যে আপনি তাড়া করবেন না, অধৈর্য হবেন না। 'তলবগার বায়েদ সাবূর ও হামুল' (–কল্যাণপ্রত্যাশীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হতে হয় –অনুবাদক)।

প্রকৃত আনন্দের কারণ ঃ এখন কোন বাহ্যিক তদ্বিরের ওপর আস্থা ও নির্ভরশীলতা নেই। আমি জানি, নির্ভুল তদ্বিরও কেবল তখনই মাথায় আসে যখন স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলা আনুমানিকতার গন্ডি থেকে রেহাই দিতে চান। কিন্তু যেমন কেউ অতি আনন্দদায়ক নেশায় বিভোর থাকে, ঠিক তেমনি আমি এজন্য অত্যন্ত খুশি যে, আমরা নিজেদের এমন একজন সর্বশক্তিমান মহানুভব প্রভুর অধিকারী, যাঁর কুদরতও রয়েছে এবং করুণাও রয়েছে। আজ আমি চারটি পুস্তক রেজিস্ট্রী করে শিয়ালকোট পাঠিয়েছি। আপনার অবগতির জন্য লিখা হলো।

ওয়স্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ইং

পত্র নং ১৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কয়েকদিন যাবত তীব্র মাথাব্যাথা হতে থাকে। আজ কিছুটা উপশম হয়েছে। কিন্তু দুর্বলতা খুব বেশি বিধায় উত্তর লিখতে অপারগ ছিলাম।

মানবীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার রহস্য ঃ প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি আল্লাহ্‌তাআলার প্রভূত অনুগ্রহ ও কৃপা রয়েছে। গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করার পর আপনি এর (যথাযথ) শোকর আদায় করতে পারবেন না। খন্ড খন্ডভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যেসব উপকরণ রয়েছে সেগুলোতেও বড় ধরণের কোন তাৎপর্য নিহিত থাকে। এর প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্বমূলে পৌঁছতে মানুষ অপারগ। এসব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর এগুলো দূরও হয়ে যাবে। "আ লাম তা'লাম আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"(-তুমি কি জান না আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বসক্ষম?-অনুবাদক)। এ তুচ্ছ ও নগণ্য বান্দার দোয়াও ইনশাআল্লাহ্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। "ওয়া লাম আকু বিদুয়ায়ী হি শাকীয়া"(-'আর তাঁর কাছে দোয়ায় আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি'-অনুবাদক)।

ধর্মীয় অনুশাসনাদি পালনে কখনও যদিও 'কব্‌য' (সংকোচ ও অনিহাবোধ) দেখা যায় অথবা সৎকার্যাবলীর প্রতি অনাগ্রহ থাকে তবুও অবস্থার এই অবনতি ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য যে অন্তরজ্বালা ও তীব্র মনঃকষ্ট হয় তাও শোকর করার দাবি রাখে। কেননা নেকী অর্জনের জন্য হৃদয় ব্যথিত থাকা, প্রকৃতপক্ষে এ-ও এক প্রকার নেকী। আমরা সার্বিকভাবে (আল্লাহ্ প্রদত্ত) নিজ এখতিয়ার ও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। সকল কারণের আদি কারণ আল্লাহ্ মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বময় নিয়ন্তা হিসেবে যিনি আমাদের মাথার ওপরে রয়েছেন, তিনি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োজন ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যেভাবে চান আমাদের সাথে আচরণ করেন। ধরুন, তিনি যদি আমাদেরকে দোযখে ফেলেন তাহলে সে দোযখ আমাদের পক্ষে বেহেশতের চেয়ে উত্তম। আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, তবু তাঁরই বান্দা।

'গার না বাশদ বা-দোস্ত রাহ্ বারুঁ।
শর্তে ইশ্‌ক আস্ত্ দর্ তালাব মুর্দন॥'

ওয়াস্‌সালাম

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২, মার্চ ১৮৮৭ইং

পত্র নং ১৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ ও সুখ-দুঃখের মূলনীতিঃ দুনিয়া উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, দুঃখ-বেদনা ও বিপদাবলীর জায়গা তা কি কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য? না বরং সবার জন্যই। যার প্রারম্ভে ভুল-ত্রুটি ও অসহায়ত্ব এবং শেষে বার্ধক্য (যদি স্বাভাবিক আয়ুষ্কালে পৌঁছায়)। আর সবশেষে মৃত্যু। 'বাংগ্ বর আয়েদ ফুলাঁ নুমান্দ' (ঘোষকের শব্দ ভেসে আসে, অমুক ব্যক্তি আর নেই-অনুবাদক)। অতএব, এখানে পুরোপুরি সুখ ও আনন্দ চাওয়া ভুল। রাবেয়া বসরী রাযিয়াল্লাহু আনহার উক্তি আছেঃ 'আমি নিজের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেছি যে দুনিয়াতে আমার জন্য আসল হচ্ছে দুঃখ-বেদনা ও মসিবত। যদি বা কখনও আনন্দ আসে, তাহলে এটি এক বাড়তি বিষয়, যাকে আমি আমার প্রাপ্য অধিকার বলে মনে করি না।' অতএব মু'মিনের উচিত, সে যেন ময়দানে অবতীর্ণ বীর পুরুষ হয়ে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে সব ধরণের তিক্ততা স্বীকার করে। আমাদের সত্তা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও ইমামগণের তুলনায় উন্নততর কিছু নয়। বরং আসল কথা হচ্ছে, আত্মসন্তুষ্টি, উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রীতি ও আনন্দ আল্লাহ্-অন্বেষায় তখনই আপনা-আপনি অনুভব হয় যখন হযরত আইয়ূবের (আঃ) ন্যায় ধৈর্যশীল হয়ে একথা বলা হয়, 'আমি উলঙ্গাবস্থায় এসেছিলাম, উলঙ্গাবস্থায়ই যাব।'

'মুফলিস শুদেম দোস্ত আয্ হর মায়াফিশান দেম।
দুযদে খবীস শয়তাঁ আয মুফলেসাঁ চে খাহাদ॥'

'ফা-ফিররু ইলাল্লাহি ওয়া কুনূলাহু মান কানা লিল্লাহি কানাল্লাহু লাহু ওয়াসসালামু আলা মানিত্তবায়ালহুদা' (-অতএব আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও এবং তাঁরাই হয়ে যাও। যে আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ও তার হয়ে যান এবং যে হেদায়াতের অনুসারী হয় তার প্রতি শান্তি অবধারিত-অনুবাদক)

বিনীত
গোলাম আহমদ

***নোটঃ** এ চিঠিটিতে কোন তারিখ লেখা নেই। আমি এটিকে ১৮৮৭ সালেরই মনে করি। (ইরফানী)*

পত্র নং ১৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার লেখা পোস্টকার্ড পেয়েছি। খোদাতাআলা আপনাকে আশু আরোগ্য দান করুন। বার বার আপনার অসুস্থ হওয়ায় আমি মর্মাহত হই। মানবীয় কারণে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বোধ করতে থাকি। খোদাতাআলা সেই দিন খুব শীঘ্র আনয়ন করুন যেদিন আমি আপনার পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভের সুসংবাদ শুনতে পাব।

চিকিৎসাগত পরামর্শ ঃ

এখন বসন্ত কাল। নিশ্চয় আপনি সময়োপযোগীভাবে কিছুটা দৈহিক অবসাদ দূরীকরণে দৃষ্টি দিয়ে থাকবেন। যদি না দিয়ে থাকেন এবং দৈহিক কোন উপসর্গ প্রতিবন্ধকস্বরূপ না থাকে তাহলে এদিকে দৃষ্টি দিন, সমীচীন কিনা। প্রতিবন্ধকতা না থাকলে নিবৃত্ত হবেন না। কিছুটা 'শীরে খিশ্‌ত' (বনজ ওষুধ) ইত্যাদি দিয়ে মনোরঞ্জন সম্ভবত সমীচীন হবে। কখনও কখনও দেখা গেছে, মাথাধরা জাতীয় উপসর্গে 'ইয়ারিজ ফয়াক্‌রা' (বনজ ওষুধের নাম-অনুবাদক) খুবই উপাদেয় হয়ে থাকে। এ অধম প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মেয়াদিভাবে চলমান মাথাব্যথার জন্য ব্যবহার করে উপকার পেয়েছে।

প্রাকৃতিক নিয়তিতে সন্তুষ্টি, উপায়-উপকরণ সযত্নে অবলম্বন ঃ

একটা বিব্রতকর খবর শোনা গেল যে, আপনার এগার শ' টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। সুতরাং একটি পত্রে এ বৃত্তান্ত লেখা আছে। এটি আপনার খেদমতে পাঠানো হলো। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।' বিপদ যা ঘটার তা অবশ্য ঘটেই যায়। কিন্তু বাহ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। যিনি দিয়েছিলেন তিনিই নিয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে অসাবধানতার পথ থেকে দুরে থাকা আবশ্যক। 'লা ইউল্‌দাগুল মু'মিনু মিন জুহরিন ওয়াহিদিন' (-মু'মিন কখনও একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না -অনুবাদক)। পরশু আমার পক্ষ থেকে আপনার নামে ঘোড়ার সুপারিশ সম্বলিত একটি চিঠি দেয়া হয়েছিল। সে চিঠি আমার নিকটাত্মীয়দের একজন, আমার চাচাত ভাই মির্যা ইমামুদ্দিন অতি মিনতির সাথে আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিল। যদিও আমি জানতাম, সেটা লেখা অসমীচীন ও অসঙ্গত। কিন্তু যেহেতু মির্যা ইমামুদ্দিন আমার নিকটাত্মীয়দের একজন, আর আমি চাই, আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর ঈমানী অবস্থা সুধরিয়ে দেন এবং মন্দ ধ্যান-ধারণা ছাড়িয়ে দেন। সেহেতু তার মনরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। লুধিয়ানার ব্যাপারটি এখন সম্পূর্ণ পাকাপাকি। আপনার সংকল্পের জন্য প্রতীক্ষা মাত্র। জনাবের কুশল সংবাদ প্রদানে খুশী করবেন। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ৫ মার্চ ১৮৮৭ইং

পত্র নং ১৮

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত ভক্তিভাজন প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার পত্রখানাও স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দোয়া করছি, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনার ওপর ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও আশিসের দুয়ার খুলে দিন। এটা পরম সত্য যে, আপনার জন্য আমার দোয়া সীমিত নয় এবং জোশ ও আবেগ বিহীনও নয়। কিন্তু তা প্রতিফলিত হওয়া সময় সাপেক্ষ (নির্দিষ্ট সময়েই এর প্রতিফলন নির্ভরশীল)। বিয়ের কাজ সমাধার উদ্দেশ্যে সুন্নত মোতাবেক ইস্তেখারায় ব্রতী হোন। তারপর যদি হৃদয়ের স্বচ্ছতায় শীঘ্র সম্পন্ন করতে আগ্রহ বোধ করেন তাহলে যথাশীঘ্রই এ পুণ্যকাজটি সেরে ফেলুন। নতুবা পুঞ্চ (কাশ্মীর) সফর শেষে তা সম্পন্ন করুন। ৫ কপি 'শোহ্‌না হক্' (পুস্তক) এবং এক খন্ড 'রিগ বেদ' রেজেস্ট্রী ডাক যোগে আপনার জন্য মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটির প্রযত্নে পাঠানো হলো। দু'এক মাসের মধ্যে এ থেকে প্রয়োজন মোতাবেক উদ্দেশ্য উদ্ধারের পর রেজেস্ট্রী ডাক যোগে ফেরৎ পাঠাবেন। কেননা কখনও কখনও আমার এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ১৪ এপ্রিল ১৮৮৭ইং

পত্র নং ১৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে কৃতার্থ হলাম। জনাবের প্রতিটি পত্র পেয়ে আমি আনন্দ বোধ করি। কেননা আমি জানি, খাঁটি বন্ধুদের অস্তিত্ব দুর্লভ কষ্টিপাথরের চেয়েও অধিক আদরনীয়। ধর্মের জন্য আপনার অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসীম সাহসিকতা বস্তুত এক ঐশী অনুগ্রহ বিশেষ। একে আমি অতি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ 'ফযল' মনে করি। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে আপনার মাধ্যমে প্রথম দর্জা ও পর্যায়ের খিদমত গ্রহণ করুন। হেকীম ফযল দ্বীন সাহেবও অতি উত্তম মানুষ। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে উত্তম পুরস্কারের দ্বারা ভূষিত করুন। সাক্ষাৎ হলে তাঁকে আপনি 'সালাম মসনুন' পৌঁছাবেন।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২৫ এপ্রিল ১৮৮৭ইং

অনুবাদ- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ?

হযরত মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

বর্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে যার সামান্য কিছু জ্ঞানও আছে, সে-ও এটা কল্পনা করতে পারবে না যে, তথাকথিত 'ইসলামিক' যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে কোন দেশের সত্যিসত্যিই কোন বিপদের আশংকা আছে। অবশ্য এই জাতীয় ক্রমবর্ধমান মনোভাব থেকে এক প্রকার বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, এবং সে দিকটার কথা ভাবলে যে কেউ বিব্রত বোধ না করে পারবে না। এবং সেই বিপদটা হচ্ছে **যুদ্ধংদেহী প্রবণতাটা খোদ ইসলামী বিশ্বের জন্যই বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা একটা অন্তর্মুখী হুমকী, যা কিনা সর্বত্রই মুসলিমদের শক্তি নষ্ট করছে। সকল ধরনের অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণ চিত্ততা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি, যা আমরা আজকের মুসলিম বিশ্বে দেখতে পাচ্ছি, তা মুসলিম জাহানের শান্তি কে সম্পূর্ণরূপে বরবাদ করে দিচ্ছে।** আহ! সত্যি বলতে কি, আমি এ ব্যাপারে সচেতন যে, 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয় সব রকমের ত্রাস সৃষ্টি, বোমাবাজি ইত্যাদির ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না যে, এই শ্রেণীর কার্যকলাপই একমাত্র সন্ত্রাসবাদ যদ্দরুন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে গোটা দুনিয়াটা। আমি বিশ্বাস করি যে, যখন কোন সরকার তার দেশবাসীর মতবিরোধকে চাপা দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যে সব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলোকেও 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আমি মনে করি একটা দেশের সরকার কর্তৃক সেই দেশের, বাম ডান যা-ই হোক, জনগণের বিরুদ্ধে গৃহীত নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের 'সন্ত্রাসবাদ'। যখন বিদেশী কোন সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালান হয়, এবং সে জন্য এখানে সেখানে বোমাবাজি করা হয়, প্লেন ছিনতাই করা হয় তখন সেই ঘটনাগুলি প্রায় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমস্ত নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডের শিকারে যারা পরিণত হয়, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্ব জনতম গড়ে উঠে, এবং এটা হওয়া উচিত। এইসব সহানুভূতিশীল শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; অনুরূপ ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর ঘটতে না পারে তজ্জন্য প্রতিরোধ ও পূর্ব-সতর্কতামূলক গঠনমূলক ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, কথা হচ্ছে, **যে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের সরকারের হাতেই কঠোর ও নির্মম দুর্ভোগের শিকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে, তাদের জন্য কি করা হচ্ছে? তাদের আর্ত চিৎকার বহির্বিশ্বে খুব কমই শোনা হয়। তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ সেন্সরশীপের কঠোর ব্যবস্থার চাপে প্রায়শঃই স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। এমন কি জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলো, যেমন এ্যামোনিষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, যদি এই সমস্ত নির্যাতন, অত্যাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর যদি সেই সব ঘটনার প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো নিন্দা জ্ঞাপন করে, যদি করেই আদৌ,**

তবে তাকে মৃদুই বলতে হবে। এই সকল ঘটনাকে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই, বিবেচনা করা হয় সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে। এগুলোকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ না বলে বলা হয় এবং ব্যাপকভাবেই বলা হয় যে, এগুলো হচ্ছে, সরকারের সন্ত্রাসবাদ দমনের এবং শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, কোন দেশের সরকার যখনই সেই দেশের জনগণের কোন জনপ্রিয় আন্দোলন বা কোন সন্দেহজনক বিরোধিতা নস্যাত করার উদ্দেশ্যে কোন বিবর্তনমূলক বা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন তা প্রায় ক্ষেত্রেই যথার্থ আইনগত সীমা ছাড়িয়ে যায়, এবং তা সবই সন্ত্রাসবাদী নিষ্ঠুর কার্যকলাপের রূপ পরিগ্রহ করে; কেননা, এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হয় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে, এতে যেন অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে মানবজাতি যত বেশি দুর্ভোগ পোহায়েছে, তার তুলনায় অন্তর্ঘাত ও ছিনতাই ইত্যাদি সন্ত্রাসী ঘটনাবলী দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভোগ নিতান্তই কম হবে। এক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে যতটা বলা যায় তা হচ্ছে, ইসলাম সুস্পষ্টরূপে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সকল প্রকারের সন্ত্রাসবাদ প্রত্যাখ্যান করে এবং তার নিন্দা করে। এই ধর্ম কোন প্রকারের কোন সন্ত্রাসকে না সাহায্য করে, না সমর্থন করে – তা সেই সন্ত্রাস কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধেই হোক, আর কোনও সরকারের বিরুদ্ধে।

অবশ্য, মুসলিম বিশ্বে এমন অনেক অস্থিরতাপূর্ণ এলাকা আছে যে সমস্ত জায়গায় দল, সংগঠন, এমনকি, কখনও কখনও সরকারও মনে হয়, লিপ্ত হয়ে পড়ে সন্ত্রাসবাদ, বিশৃংখলা ও অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকান্ডে। এ সব ব্যাপারে, প্যালেস্টাইন, লেবানন, লিবিয়া এবং সিরিয়া প্রায়ই খবরে আসে। অধিকাংশ ঘটনাতেই দেখা যায় যারা জড়িত তারা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে মুসলমান। তবে, ব্যতিক্রমও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

ফিলিস্তীনিদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ চালাতে বদ্ধ পরিকর, কিন্তু তারা ধর্মবিশ্বাসে খৃষ্টান। নিজেদের সুবিধার্থে কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো তাদেরকেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বলেই চালিয়ে থাকে। লেবাননে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী আছে, খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদী আছে, সেই সঙ্গে আছে ইহুদী চরেরা ও আবেগ-অনুভূতিকে সাংঘাতিকভাবে আতংকিত করে তোলে।

কিন্তু, আপনি এমন কথা কখনও শুনবেন না যে, লেবাননে যা ঘটছে তার মধ্যে ইহুদী অথবা খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদও জড়িত আছে। সমস্ত সন্ত্রাসী ক্রিয়াকান্ডকে একত্রে জড়ো করে, বোঁচকা বেঁধে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ'।

সালমান রুশদির ব্যাপারটাতে তো কোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষ, যার কুরআন শরীফের সামান্য কিছু সঠিক জ্ঞান আছে, সে-ও বলতে পারবে না যে, ইমাম খোমেনীর ঐ মৃত্যু-দন্ডাদেশটা ছিল ইসলামী আইন সম্মত। ব্লাসফেমী বা ঈশ্বরনিন্দার জন্য এরূপ কোনও শাস্তির বিধান নেই কুরআন করীমে এবং ইসলামের পবিত্র নবী (সঃ)-এর হাদীসে। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী বা নিন্দার কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে এভাবে ঃ

"এবং তোমরা ওদেরকে এভাবে গালি দিও না, যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেই গালি দিবে।" (আল্ আন্ আম – ৬ঃ১০৯)

আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী বা নিন্দা করার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি কোনও মানুষকে।

যীশু খৃষ্ট (আঃ)-এর মা হযরত মরিয়মের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমীর অপরাধ করেছিল ইহুদীরা। এই বিষয়টিকে পবিত্র কুরআন উল্লেখ করেছে এইভাবে ঃ

"এবং তাদের অস্বীকারের (কুফরীর) কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে।" (আন্ নিসা ৪ ঃ ১৫৭)

এক্ষেত্রেও স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কোনো প্রকারের শাস্তি দিতে পারবে না বলেই বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং পরিতাপের ব্যাপার যে, ইমাম খোমেনী ইসলামকে সমর্থন করার পরিবর্তে, তার ঐ কাজের (মৃত্যু-দন্ডাদেশের) দ্বারা, ইসলামের কলংক রটনা করেছেন। এবং মুক্ত-বিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তির অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছেন।

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের (কায়রো) গ্রান্ড মসজিদের ইমাম সাহেব ইমাম খোমেনীর ঐ 'ফতওয়া'কে ইতোমধ্যেই নাকচ করে দিয়েছেন। এবং আমি নিশ্চিত যে, এমন সব আরো অনেক শিয়া মুসলমান রয়েছেন যাঁরা এ ব্যাপারে ইমাম খোমেনীর সঙ্গে একমত হবেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও, আসল যে, ইস্যু, সেটাকে উপেক্ষা করাটা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না। আমি মনে করি, সালমান রুশদির নিন্দা না করে কেবল খোমেনীর নিন্দা করাটা-যেমন অনেক রাজনীতিবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তিরা করেছেন- তা অন্যায়। রুশদী এমন একটা বই লিখছে যার দ্বারা সে ইচ্ছাকৃতভাবে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের মনে চরম ভাষায় আঘাত দিয়েছে। শুধু তাই নয় এই বইটা মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যেকার শান্তিপূর্ণ সম্পর্কেরও ক্ষতিসাধন করেছে, এবং বইটা সম্পর্কে জাতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে যে সমস্ত চিঠি-পত্র প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেগুলোতে যে সমস্ত মন্তব্যাদি করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে যে কেউ বলতে পারেন যে, বইটার মাধ্যমে গোত্রীয় বা ফের্কাগত অসহিষ্ণুতার শক্তিগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমি যে কোন প্রকারের সন্ত্রাসবাদিতাকে কোনভাবেই সমর্থন করি না, তা সেই সন্ত্রাসবাদের বর্ণ, ধর্ম, আবেগ-অনুভূতি অথবা উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন। ইসলাম আমার ঈমান, আমার ধর্ম এবং ইসলাম কোন ধরনের বিশৃংখলাকেই সমর্থন করে না। ইসলামের অবস্থান সন্ত্রাসবাদী শিক্ষার নাগালের বাইরে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, কর্ণেল গাদ্দাফির তৈল-ডলারের সাহায্যে যে সন্ত্রাসবাদকে সংগঠিত করা হয়, সমর্থন করা হয়, সেটার ধর্ম তাহলে কি? তাছাড়া, এতদিন সিরিয়া যে সকল সন্ত্রাসবাদি কান্ডকীর্তি চালিয়ে আসছিল, সেগুলোর ধর্মই বা কি? তা কি ইসলাম? যদি তা-ই হয়, তাহলে এই ইসলাম এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে তফাৎটা কোথায়?এটা কি সত্য নয় যে, কর্ণেল গাদ্দাফির 'গ্রীন বুক' (সবুজ পুস্তক) শুধু তার প্রচ্ছেদেই 'গ্রীন' (সবুজ)? এই বইটার বিষয়-বস্তুতো আগা গোড়াই সম্পূর্ণ লাল।

ইরানের অথবা লিবিয়ার মুসলিম 'মৌলবাদীদের' সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে যদি 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে ইসলামের রঙ হবে গাঢ় সবুজ – ডার্ক গ্রীন। এটা একটা তাজ্জবের ব্যাপার যে, ইসলামের যে, ধারণা (কনসেপ্ট), তা কি করে স্বয়ং স্ববিরোধী হতে পারে, এবং কি করে তা একই সঙ্গে সবুজও হতে পারে লালও হতে পারে! যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে লিবিয়ার সন্ত্রাসবাদকে বলতে হবে যে, সেটা হচ্ছে ছদ্মবেশে জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদ। এই প্রসঙ্গে, যে কেউ কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কথা তো বলতে পারেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রো তো তার দমন-পীড়নও সন্ত্রাসবাদে কর্ণেল

গাদ্দাফিকে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে। তবু তো এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি যে, তার কার্যকলাপকে বলা হচ্ছে 'খৃষ্টান সন্ত্রাসবাদ'।

কথাতেই কথা আসেঃ সন্ত্রাসবাদের আলোচনা থেকে যে কারো দৃষ্টির সামনে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ভেসে উঠতে পারে। এক সময় খৃষ্ট ধর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই বহু বিভৎস অত্যাচার ও নির্যাতনে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। অনেক খৃষ্টান রাজা-বাদশাহও সন্ত্রাস নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়নের নিষ্ঠুর সব কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা এসব করেছেন এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তাঁরা যীশু খৃষ্টের (আঃ) ধর্মের সেবাই করেছেন। 'কালো মৃত্যু'র (Black Death) এক সময়ে ১৩৪৮-৯ বৎসরগুলোতে, কি বহু ইহুদীকে তাদের বাড়ীতে তাদের ঘরের ভিতরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়নি? স্পেনিশ ইন্‌কুইজিশন- (রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানের জন্য চার্চ কর্তৃক গঠিত আদালত)- এর যুগে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের নির্দেশে এবং পরিচালনায় দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল। বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য অসহায় নারীকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল এই অভিযোগ যে, তারা ছিল ডাইনি। এবং তখনকার দিনে এই ধরনের একটা উদ্ভট ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, খৃষ্টধর্মমতে ডাইনীগিরির শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড।

এই সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের জড়িত থাকার ব্যাপারটা যতটাই হোক না কেন, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানবতার বিরুদ্ধে তখন সে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল তা সবই ছিল এমন এক যুগের ঘটনা যে যুগে অজ্ঞতাই সবকিছুকে আচ্ছন্ন করেছিল। কে জানে মানুষ কখন বুঝতে শুরু করবে যে, একজন লোকের চরিত্র এবং তার ধর্মের শিক্ষার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। কেউ যদি এই দু'য়ের একটার সঙ্গে অপরটাকে ঘুলিয়ে ফেলে, এবং ধর্মকে তার অনুসারীদের চরিত্রের মানদন্ডে বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে তো বহু প্রশ্ন দেখা দিবে। কেননা, প্রতিটি ধর্মেরই অনুসারীদের চরিত্র তো দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রাদায়ে, যুগে যুগে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

যীশু খৃষ্টের (আঃ) সেদিনের অনুসারীদের চরিত্রের সঙ্গে এদিনের পিনোচেটের চিলি অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁর অনুসারীদের পার্থক্যটা যে কত বড় প্রকট তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারা করবে খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব? আমরা কি একথা বলার অধিকার রাখি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ, যাতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে, সে যুদ্ধগুলো ছিল মানবতার বিরুদ্ধে খৃষ্টান যুদ্ধ? দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে একমাত্র রাশিয়াতেই এক হিসেবে প্রাণহানি ঘটেছে ৬১ লক্ষেরও বেশি মানুষের। বসনিয়ার তিন-চহুর্থাংশ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর এত বিপুল পরিমাণে ক্ষতি সাধন হয়েছে যে, তার হিসেব করাই অসম্ভব।

এই বিপুল সংখ্যার প্রাণহানি এবং অপরিমেয় সম্পদ ধ্বংসের জন্য আমরা কি বলবো যে, এ সবই ছিল খৃষ্টধর্মের কাজ, অথবা আমরা কি খৃষ্টধর্মের উপলব্ধি অর্জন করবো সেই সকল প্রাথমিক খৃষ্টানদের থেকে যাঁরা এক গালে চর খেলে অপর গাল পেতে দিতেন আঘাতকারীর সামনে, এবং যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় হিংস্র জন্তু দিয়ে খাওয়ানো হতো এবং জীবন্ত পুড়ে মারা হতো তাদের নিজেদের ঘরেই আবদ্ধ করে; অথচ, যারা কখনই সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাসের জবাব দিতেন না? আমি তো এদেরকেই পসন্দ করবো, নির্দ্বিধায়।

একজন লোকের চরিত্র এবং তার ধর্মের শিক্ষার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। কেউ যদি এই দু'য়ের একটার সঙ্গে অপরটাকে ঘুলিয়ে ফেলে, এবং ধর্মকে তার অনুসারীদের চরিত্রের মানদন্ডে বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে তো বহু প্রশ্ন দেখা দিবে। কেননা, প্রতিটি ধর্মেরই অনুসারীদের চরিত্র তো দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রাদায়ে, যুগে যুগে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

যে কোন মুসলিম দেশে যে কেন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটুক না কেন, সেটাকে পাশ্চাত্যে এই বলে চালিয়ে দেয়া হয় যে, সেটা ছিল আসলে একটা 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ'।

অথচ, অনুরূপ ঘটনা অন্য কোন দেশে ঘটলে তাকে বলা হয় রাজনৈতিক বিবাদ। এই দিনে, এই যুগে এই বিচারের দ্বৈত মানদন্ড ডবল স্ট্যান্ডার্ড কেন? এর দরুন যে কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারে যে, হয়তো খৃষ্টান সভ্যতার দৃশ্যতঃ প্রশান্ত অবস্থার তলদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার একটা অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলছে। এটা কি তাহলে, মুসলিম শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে শত শত বৎসর ধরে যে 'ক্রুসেড' (ধর্মযুদ্ধ) চালানো হয়েছিল তারই একটা বিদ্বেষের রেশ? অথবা এটা কি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের পুরাতন সেই বিষাক্ত সুরাই নতুন বোতলে পরিবেশন? সেই ধারণাটা ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, - তা তো অত্যন্ত আপত্তিকর। মুসলিম সরকারগুলোর যে যুদ্ধ-বিগ্রহ তার তো বিচার করা উচিত প্রচলিত রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতি-নীতির ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়।

সন্ত্রাসের সংঘটন সমাজের বহু প্রকার ব্যাধির উপসর্গাদির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আজকের দুনিয়ার মুসলমানরা জানেই না যে, কোন পথে মুখ ফেরাতে হবে। জনসাধারণ এমন বহু ব্যাপারে অসন্তুষ্ট যেগুলোর উপরে তাদের কোনভাবেই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা এখন তৈরি খাদ্য– যা ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের দুর্নীতিপরায়ন নেতাদের দ্বারা অথবা বিদেশী সব এজেন্ট ও ক্রীড়ণকদের দ্বারা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, মুসলিম দেশগুলোতেও বহু নেতা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্যেও ইসলামের সমর্থন পেতে চেষ্টা করে, যেমনটা ঘটেছিল পাকিস্তানে প্রয়াতঃ জেনারেল জিয়া-উল-হকের আমলে। রক্তাক্ত বিপ্লব ইসলামের দর্শনে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব, ইসলামী দেশগুলোতে এইরূপ বিপ্লবের কোন স্থান নেই, থাকতে পারে না।

আমি একজন ধর্মের লোক হিসেবে, এবং একটি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় বা ফের্কার অনুসারীদের নেতা বা ইমাম হিসেবে যে সম্প্রদায়ের লোকেরা বিগত এক শতাব্দীকাল যাবৎ দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস ও নির্মম সব অত্যাচারের কবলে পড়ে দিন কাটাচ্ছে আমি সকল প্রকারের সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে অত্যন্ত তীব্রভাবে নিন্দা করি, ঘৃণা করি। কেননা, এটা আমার একটা গভীর বিশ্বাস যে, শুধু ইসলামই নয়, যে কোন সত্য ধর্ম - নাম তার যা-ই হোক না কেন তা সন্ত্রাসকে সমর্থন করতে পারে না, সমর্থন করতে পারে না, আল্লাহ্‌র নামে নিরীহ নিরপরাধ নারী-পুরুষের, ছেলে-মেয়েদের রক্তপাতকে।

আল্লাহ্‌ই প্রেম, আল্লাহ্‌ই শান্তি!
প্রেম কভু ঘৃণার জন্ম দেয় না : এবং
শান্তি কভু যুদ্ধের প্রতি ধাবিত করে না।

(সমাপ্ত)

(পুস্তক-আল্লাহ্‌র নামে নরহত্যা)

অনুবাদ-শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত

(কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থানসমূহ)

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

আরো কিছু স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক স্থান

গোল কামরা

মসজিদে মোবারকের পূর্ব দিকের বড় সিড়ি দিয়ে আরো উপরে উঠলে ডান দিকে একটি গোল কামড়া দেখা যাবে। এই ঐতিহাসিক কামরা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব রাযীয়াল্লাহুতাআলা আনহু লিখেন:-

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মসজিদে মোবারকের পর সম্ভবত দ্বিতীয় নির্মাণ কাজ ছিল গোল কামরার নির্মাণ। মসজিদে মোবারকের পুরাতন সিড়ি দিয়ে এর দরজা খোলা হয়। পূর্বে এই কামরা মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং এখানে মেহমানদেরকে খাবার খাওয়ানো হতো। আর কাতেব এখানে বসে পান্ডুলিপির কপি লিখতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই স্থানেই বন্ধুগণের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ) পেনশন নিয়ে চলে আসেন। তখন তিনি গোল কামরার সামনে প্রাচীর তৈরী করে পর্দা করে নিলেন এবং এটাকেই তাঁর বসবাসের স্থান করে নিলেন।" (সীরাতুল মাহ্দী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৬) এই ঐতিহাসিক কামরাও দেখা যেতে পারে।

প্রাচীর

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের স্থাপিত জামাত যখন উন্নতি করতে আরম্ভ করলো তখন ইবলিসী শক্তিগুলো একে কীভাবে সহ্য করতে পারে? বিরুদ্ধাচরণের জন্য এদের মাধ্যের মাঝে যত পথ খোলা ছিল তার সব কয়টিই তারা গ্রহণ করলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চাচাতো ভাই মির্যা ইমাম উদ্দীন কেবলমাত্র তাঁকে (আঃ) উত্তক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করার জন্য তাঁর (আঃ) গৃহের সামনে ১৯০০ সালের ৫ই জানুয়ারী আট ফুট উঁচু, দশ ফুট লম্বা এবং দেড় ফুট চওড়া একটি প্রাচীর নির্মাণ শুরু করলো। এই প্রাচীর হুযূর আলাইহিস সালামের আঙ্গিনা থেকে শুরু করে মসজিদে মোবারকের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৭ই জানুয়ারীতে এই পীড়াদায়ক প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রথম দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণকে মির্যা ইমাম উদ্দীনের কাছে পাঠান। কিন্তু তিনি কোনভাবেই এই প্রাচীর ভাংতে রাজী হননি। অতঃপর তিনি (আঃ) জেলা প্রশাসনের স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু সেখানেও ডিপুটি কমিশনারের মনোভাবকে শত্রুতামূলক দেখা গেল। অবশেষে বাধ্য হয়ে দেওয়ানী আদালতে দাবী পেশ করা হলো। ১৯০১ সালের ১২ইং আগষ্টে আদালত প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয় এবং ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যা চারটার সময় সেই মেথরকে প্রাচীর ভাংতে হলো, যার দ্বারা ইমাম উদ্দীন তা নির্মাণ করিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম লিখেন ঃ

"যখন বিরুদ্ধবাদীরা দাবীর সাথে বলতো মোকদ্দমা অবশ্যই খারিজ হয়ে যাবে এবং আমার সম্পর্কে বলতো, আমরা তার সব দরজার সামনে প্রাচীর তৈরী করে এমন কষ্ট দেব যেন সে কারাবন্দী হয়ে পড়ে, এরূপ সময়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। খোদা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সংবাদ দেন, আমি এমন একটি বিষয় প্রকাশ করবো যাতে যে পরাজিত সে বিজয়ী হবে এবং যে বিজয়ী সে পরাজিত হয়ে যাবে।"

"এরপর সিদ্ধান্তের দিন এলো। সেদিন আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা খুব আনন্দিত ছিল। আজ খারিজ মামলার আদেশ শুনানো হবে এবং তারা বলাবলি করছিল, সব ধরনের কষ্ট দেয়ার সুযোগ আজ থেকে আমাদের হাতে এসে যাবে। সেদিনই ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনার এই অর্থ বোঝা গেল যে, এটা একটি গুপ্ত বিষয়, যার মাধ্যমে মোকদ্দমা ঘুরে যাবে এবং অবশেষে তা প্রকাশ করা হবে। অতএব ঘটনা এমনটিই ঘটলো যে, সেদিন আমাদের উকিল খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের মনে হলো অতীত উদাহরণের ইনডেক্স অর্থাৎ পরিশিষ্টে গুরুত্বপূর্ণ আদেশাবলীর সার-সংক্ষেপ লেখা থাকে। যখন তা দেখা হলো তখন সে কথা বেরিয়ে এলো, যা বের হওয়ার আশা ছিল না। অর্থাৎ বিচারকের সত্যায়িত সেই আদেশ বেরিয়ে এলো যাতে লেখা ছিল, জমির মালিক কেবল ইমাম উদ্দীন নয় বরং মির্যা গোলাম মোর্তুজা অর্থাৎ আমার পিতাও মালিক। এটা দেখার পর আমাদের উকিল বুঝে গেল মোকদ্দমায় আমাদের জয় হয়ে গেছে। বিচারকের কাছে এটা বর্ণনা করা হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ইনডেক্স চেয়ে পাঠালেন। দেখার সাথে সাথেই বিষয়টি তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। অতএব তৎক্ষণাৎ তিনি মোকদ্দমার খরচসহ ইমাম উদ্দীনের বিরুদ্ধে জমির ডিক্রী প্রদান করে দিলেন।"

(হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ২৬৯, ২৭২)।

যেখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল সে জায়গা আজও দেখা যেতে পারে এবং নিজেদের ঈমানকে আলোকিত করা যেতে পারে। কোথায় গেল প্রাচীর নির্মাণকারী? আর যাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল তারাতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হচ্ছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরিবারের পূর্বপুরুষগণের কবরস্থান

হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পিতৃপুরুষদের প্রাচীন কবরস্থান কাদিয়ানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই কবরস্থানে হুযূর (আঃ) এর শ্রদ্ধেয়া মাতা চেরাগ বিবি সাহেবার কবর রয়েছে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। হুযূর আলাইহিস সালাম যখনই তাঁর কথা বলতেন তখনই তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানীর (রাঃ) নিজ চোখে দেখা বর্ণনা হলো, একবার হুযূর আলাইহিস সালাম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিজেদের পুরাতন পারিবারিক কবরস্থানের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে তিনি (আঃ) আবেগের সাথে নিজের শ্রদ্ধেয়া মাতার মাজারে এলেন এবং নিজ খাদেমগণসহ দীর্ঘ দোয়া করেন এবং তাঁর চোখ পানিতে ভরে গেল (হায়াতে আহ্মদ, প্রথম খন্ড, নম্বর ২, পৃষ্ঠা ১৪৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের শ্রদ্ধেয় পিতা ও শ্রদ্ধেয় দাদার কাছে এই কবরস্থান এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, হুযূর আলাইহিস সালামের দাদা মির্যা আতা মুহাম্মদ সাহেব যখন কপুরতলাস্থ বেগোয়াল ষ্টেটে আশ্রয় নিলেন এবং ১৮১৪ সালে সেখানেই মারা গেলেন তখন হুযূর (আঃ) এর পিতা হযরত মির্যা গোলাম মোর্তুজা সাহেব তাঁর মৃতদেহ নিজেদের পিতৃপুরুষের কবরস্থানে দাফন করার জন্য রাতারাতি কাদিয়ান নিয়ে আসেন এবং শিখদের বাধা সত্ত্বেও বড় সাহসিকতার সাথে তাঁকে নিজেদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন।

(সূত্র : হায়াতে তাইয়েবা, পৃষ্ঠা-৭)।

হযরত মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব রাযীয়াল্লাহুতাআলা আনহু লিখেন:-

"কাদিয়ানের যে কবরস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশের লোকগণ দাফন হতে থাকেন তা স্থানীয় ঈদগাহের কাছে। এটা একটি সুবিস্তৃত কবরস্থান এবং কাদিয়ানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশের যে সকল ব্যক্তির কবরের কথা আমি জানতে পেরেছি এর মাঝে কোন কোন কবরের নকশা পর পৃষ্ঠায় অংকন করা হলো।

এই নকশায় শাহ্ আব্দুল্লাহ্ সাহেব গাজীর কবরও দেখানো হয়েছে। তিনি একজন ফকীর ধরনের বুযুর্গ ছিলেন। আমি এই সংবাদ শেখ নূর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে এই কবরস্থানের ফকির ঝন্ড শাহের কাছ থেকে পেয়েছিলাম এবং শাহ্ আব্দুল্লাহ্ গাজী সম্পর্কে আমি আজিজ মির্যা রশীদ আহমদের কাছ থেকে জেনেছি যে, তিনি মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেবের (হযরত সাহেবের প্রপিতামহ) যুগে এক ফকীর ধরনের বুযুর্গ ছিলেন। এই বুযুর্গের মৃত্যুর পর মির্যা গুল মুহাম্মদ সাহেব তাঁর মাযার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। আমাদের সহোদরা বোন উম্মাতুল নাসীরের কবরও এই কবরস্থানেই রয়েছে।

মসজিদে নূর

দেশ বিভাগের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পূর্বে কাদিয়ানে প্রায় ১২টি মসজিদ ছিল। এ ছাড়া আরো কয়েকটি স্থানেও নামায আদায় করা হতো। দেশ বিভাগের পর মসজিদে মোবারক, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নাসেরাবাদ এই তিনটি মসজিদে নিয়মিতভাবে বাজামাত নামায পড়া জারী থাকে। এখন আটটি মসজিদে বাজামাত নামায পড়া জারী রয়েছে। উপরোল্লেখিত তিনটি মসজিদ ছাড়াও দারুল আনওয়ার, দারুল বরকত, দারুর রহমত, কুঠী দারুস সালাম, দারুল ফতুহ্তেও বাজামাত নামায আদায় করা হয়ে থাকে।

মসজিদে নূরও কাদিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ সমূহের অন্যতম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) ১৯১০ সালের ৫ই মার্চ এই ঐতিহাসিক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর নির্মাণে তিন হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এই অর্থের যোগান দিয়েছিলেন হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ)। এই মসজিদ তালিমুল ইসলাম স্কুল ও কলেজের বেষ্টনীতে অবস্থিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর মৃত্যু হয়েছিল ১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ কুঠী দারুস সালামে, এটা কলেজ ও মসজিদে নূরের উত্তর দিকে অবস্থিত। ১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ এই মসজিদে নূরেই হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন সাহেব (রাঃ) দ্বিতীয় খলীফা নিযুক্ত হন এবং প্রায় দু'হাজার লোক সেই সময় তাঁর হাতে বয়াত করেছিলেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর জানাযা হাইস্কুলের উত্তরে অবস্থিত মাঠে পড়িয়েছিলেন।

এটাই সেই ঐতিহাসিক মসজিদ, যেখানে আহমদীয়া জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক কুরআন মজীদ, হাদীস, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর নির্দেশাবলীর অনুসরণে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার করেছিল। আর মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের নেতৃত্বে কিছু লোক খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কাদিয়ান ছেড়ে লাহোর চলে গিয়েছিল। অতীতের দীর্ঘ সময় এই সত্যকে প্রকাশিত করে দিয়েছে যে, খেলাফতই উম্মতের জীবিত থাকার ও উন্নতি করার মাধ্যম। এটাই সেই 'হাবলুল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ্র রশি), যা মানুষকে তার প্রভু-প্রতিপালক পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয় এবং মু'মেনদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। যারা এই 'হাবলুল্লাহ্' থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল, তারা বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং পৃথিবীর গভীর সমুদ্রে ডুবে গেল।

এই মসজিদও জেয়ারতের জন্য এবং সালানা জলসার দিনগুলোতে খোলা থাকে। উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ছাড়াও বন্ধুগণ নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহও কাদিয়ানে দেখতে পারেন।

লঙ্গরখানা, মেহমানখানা, বর্তমান তালিমুল ইসলাম স্কুল, মাদ্রাসা জামেয়া আহমদীয়া, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তরসমূহ, কাসরে খেলাফত, নূর হাসপাতাল, পুরাতন ও নুতন বিল্ডিং সমূহ, গেষ্ট হাউস, দারুল আনোয়ার ছাড়াও আরও অনেক স্থান রয়েছে। (চলবে)।

মূল : মুহাম্মদ হামীদ কাওসার

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

ঈদ উৎসব-ই না ইবাদতও

বর্ষ পরিক্রমায় প্রতি বছর মুসলিম উম্মাহ্‌র দরজায় আত্মসংযম, আত্মোপলব্ধি, তাকওয়া এবং মহান কুরবানীর শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয় পবিত্র ঈদ। সারা মুসলিম জাহানে সিয়াম-সাধনা এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বান্দা তাঁর অতীতের সকল কর্মকান্ডের ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী জীবনে এ প্রশিক্ষণলব্ধ আমলে সালেহ যথাযত কাজে লাগিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম এর পথে চলার অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হওয়ার এক সফল অনুষ্ঠান এ পবিত্র ঈদ।

ইসলাম ধর্ম বিকশিত হবার বহুপূর্বে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও ধর্মের অনুসারীবৃন্দ নানা ভাব ও ভঙ্গিতে ঈদ পালন করতো। একমাত্র ইসলাম ধর্মেই ঈদকে সার্বজনীন রূপে রূপায়ণ করা হয়েছে। 'ঈদ' শব্দটি "আওদ" শব্দ হতে সৃষ্টি হয়েছে। ঈদ অর্থ ঃ আনন্দ, আমোদ, আহলাদ, উৎসব ইত্যাদি। আওদ অর্থ ঃ ফিরে আসা, বার বার আসা। অতএব যে আনন্দ বা উৎসব বিশ্ববাসীর মাঝে বার বার ফিরে আসে তাকেই ঈদ বলা হয়।

ঈদ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলে করীম (সঃ) মদীনাতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে, সেখানের অধিবাসীরা বছরে দুটি দিন খেলাধূলা ও আনন্দ উৎসব করে থাকে। হুযূর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন এ দুটি কিসের দিন? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, জাহেলিয়াতের যুগে আমরাও এ দু'টি দিনে খেলা-ধূলা ও উৎসব পালন করতাম। হুযূর (সঃ) এ কথা শুনে বললেন, "আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে এ দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন। তা হলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা" (আবু দাউদ তিরমিযী)।

ঈদুল ফিতর বলা হয় মাহে রমযানের সিয়াম পালনের পর উপবাস ভঙ্গকরণকে। দীর্ঘ একটি মাস আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে রোযা রাখার পর বিশ্ব মুসলিম এ দিনটিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দোৎসব করে বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'ঈদুল ফিতর'।

আসলে ঈদ কী? ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য ও শিক্ষনীয় বিষয়ই বা কী? মুসলিম উম্মাহ আজ ঈদের সঠিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। প্রকৃতপক্ষে ঈদ নিছক কোন আনুষ্ঠানিকতার নাম নয় বরং মহান রাব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি রহমত। আল্লাহ্‌র দেয়া একটি আদেশ, আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতীক হিসাবে পালন করা হয়। অন্য কথায় ঈদ হলো তাকওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক, তথা আল্লাহর রসূল (সঃ) এর অপছন্দনীয় সকল কর্ম থেকে বিরত থাকাই প্রকৃত ঈদ, প্রকৃত আনন্দ। তাই এটি মুসলমানের নিকট অতি পবিত্র ও মর্যাদাশীল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ইবাদতের একটি অঙ্গ। এ কথা স্বত ঃ সিদ্ধ যে, কোন অনুষ্ঠান তখন ইবাদতের যোগ্যতা লাভ করে যখন তা আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। কিন্তু এতে যদি মানব প্রকৃতি নিঃসৃত কোন যুক্তিতর্ক দর্শন মতবাদ যুক্ত হয়ে হুকুম আহকামাদির কোন বিষয়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয় তখন এটা ইবাদতের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। ইবাদতের প্রাণ বিলীন হয়ে যায়। কেননা কুরআন হাদীসের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠানই ইবাদত হতে পারে না। কেবল মাত্র শরীয়ত সম্মত উৎসবে ইবাদত বলে গণ্য হয়ে থাকে। এ ধরণের উৎসবই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় এবং তাই ইবাদত। সুতরাং ঈদ হল আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) এর পছন্দনীয় একটি ধর্মীয় ইবাদত-ধর্মীয় উৎসব। ঈদ-এর ইবাদতে শরীয়ত নির্দেশিত কিছু বিধি-বিধান রয়েছে যা পালনে সামাজিক জীবনে পারস্পারিক আন্তরিকতা সহমর্মিতা ও বন্ধন সু-সংহত হয়। ঈদে শরীয়ত নির্দেশিত দিক হল ঈদের নামাযের পূর্বে রোযার ফিতরানা ও ফিদিয়া আদায় করা, ঈদগাহে দু'রাকাত নামায আদায় করা এবং খুতবা শুনা এবং উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করা। অপরদিকে ঈদুল আযহার নামায শেষে ইব্রাহীম (আঃ) এর সুন্নত মোতাবেক পশু জবাই করে শরীয়ত বিধান মতে বন্টন করাই হলো ইবাদত। এরকম ঈদই সাহাবায়ে কেরাম ও রসূল (সঃ)এর জীবনে পালিত হয়েছে। এরকম ঈদ মানুষের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ও তাকওয়া হাসিলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এতে পরস্পরের ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ শত্রুতা দুর হয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশে চরম ও পরম আনন্দ অনুভব হয়, এটার নামই প্রকৃত ঈদ।

ঈদ হলো তাকওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক, তথা আল্লাহর রসূল (সঃ) এর অপছন্দনীয় সকল কর্ম থেকে বিরত থাকাই প্রকৃত ঈদ, প্রকৃত আনন্দ।

শুধু আনন্দ-উৎসব করে দিনটি কাটালেই প্রকৃত ঈদ পালিত হয় না। প্রকৃত ঈদ তখনই পালিত হবে যখন হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে। একটি হাদীসে এসেছে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে ঈদের নামাযের দিন উপস্থিত হলাম। তিনি খুতবার পূর্বে নামায পড়ালেন। এর পূর্বে কোন আযান ও হলো না বা কোন একামতও না। পরে নামায শেষ করে তিনি লোকদের তাকওয়া বা খোদাভীরুতা অবলম্বনের জন্য এবং তাঁর (সঃ) প্রতি আনুগত্যের প্রবণতা সৃষ্টির উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাকওয়া শিক্ষা দিয়ে বল্লেন যে, এটিই সবচে উত্তম ঈদ। ঈদকে যেসব কথা সার্থক ও সুষমামন্ডিত করে তার প্রাণ হল তাকওয়া। সুতরাং যদি তাকওয়ার সাথে ঈদ পালিত হয় তাহলে কাপড় নতুন হোক বা পুরাতন এতেই ঈদ সজ্জিত হবে (মুসলিম)।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে কুরআন-হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালিত করে না তাদের জন্য ঈদ নয়। তাদের জন্য এ ঈদ একটি আনন্দ-মেলা বৈ কিছু নয়। কেননা বাহ্যিক কোন আচার অনুষ্ঠান ও আনন্দের মধ্যে কোন সুখ নেই। শুধু নতুন কাপড় পরিধান করলে আর সু-স্বাদু খাবার পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে ঈদ হয় না। বরং যারা পরকালের শাস্তির ভয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে বেঁচে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালিত করে তাদের জন্য প্রকৃত আনন্দ প্রকৃত ঈদ। সুতরাং ঈদের মূল কথাই হচ্ছে জীবনের সর্বস্তরে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালিত করে পরস্পরের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকাই ঈদের আসল উদ্দেশ্য ও আনন্দ। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত ঈদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যথাযতভাবে কুরআন হাদীসের আলোকে নিজের জীবন পরিচালিত করা। তাহলেই ঈদ হবে স্বার্থক আর এ রকম ঈদই হবে ইবাদত। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে প্রকৃতভাবে ঈদ পালন করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

মাহমুদ আহমদ সুমন

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালবাসা লাভের জন্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করা যেখানে একটি অতি বড় পুণ্য ও মঙ্গল এবং দেশেরও মঙ্গল লাভের একটি বড় প্রত্যাশা সেখানে এটা একটি আর্থিক ইবাদতও বটে।

যে জাতি মজুদদারী ও ধন-সম্পদ জমা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর জাতীয় প্রয়োজন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে উদার মনে ব্যয় করতে ইতস্তত করে, ধ্বংস ও বিনাশ এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিৎনা-ফাসাদ এবং নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা তাদের ললাটের লিখন হয়ে যায়। এতেও কৃপণ জাতি হাবুডুবু খেতে থাকে। মানুষ যে ধন-সম্পদ লাভ করে তা আল্লাহ্‌ই দিয়ে থাকেন। আর এটা তাঁর আমানত। আল্লাহ্‌তাআলা যদি এ আমানত থেকে কিছু নিতে চান আর বান্দাকে তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করতে বলেন তাহলে আনন্দ ও পূর্ণ প্রশান্তির সাথে আল্লাহ্‌তাআলার এ আদেশকে মান্য করা এবং তাঁর পথে ব্যয় করা মানুষের বড়ই সৌভাগ্য ও তাঁর পক্ষ থেকে আরও কল্যাণ লাভকারী হওয়ার সুনিশ্চিত ও অকাট্য মাধ্যম।

আল্ খলকু আয়ালুল্লাহ্ (সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার) হাদীসের অধীনে জীবনের দিক থেকে সব মানুষ আল্লাহ্‌র সকাশে একই রকম অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী। আর বিশ্বের সম্পদরাজিতে সবাই একই রকম অংশীদার। যদিও নিজ নিজ উপায় উপকরণ এবং সামর্থ্যের দিক থেকে সকলের মালিকানার পরিমাণ এক নয়। বরং অবস্থার প্রেক্ষিতে কারও কারও নিকট সম্পদ বেশি থাকে এবং কারও নিকট কম। একজন রুজি-রোজগারের পদ্ধতি ভালভাবে জানে। আবার অন্য একজন এ ব্যাপারে আনাড়ি বা অদক্ষ। উপায় উপকরণও নেই। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে দুর্বল, উপায়হীন ও নিঃস্ব নিজ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। কুরআন করীমের আয়াত **ওয়া ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুল্লিস্‌সায়িলি ওয়াল মাহ্‌রূম** (আর এদের ধন-সম্পদে যারা চায় এদের অধিকার ছিলো আর যারা চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার ছিলো (সূরা যারিয়াতঃ ২০)-এ এই তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। অতএব বিত্তবানদের কর্তব্য, তাদের সম্পদে অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তা যেন সানন্দে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আদায় করে। এতে তাদের নিজেদের মঙ্গল ও তাদের তহবিলে যে অর্থ আছে এর প্রকৃত সংরক্ষণের রহস্য নিহিত। দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি নির্দেশ, তারা অন্যদের ধন-সম্পদের প্রতি ঈর্ষা, লালসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার নিয়্যতে যেন না তাকায়। আর অবৈধ পন্থায় হাতিয়ে নেয়ার ও এর ওপর শক্তিপ্রয়োগে দখল করার পথ যেন অবলম্বন না করে। অন্যদিকে বিত্তবানদের প্রতি নির্দেশ তারা সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি যেন দৃষ্টি রাখে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, খাবার, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতির সমস্যায় এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে না দেয়, যা এতই করুণ যে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এতে তাদের সংকীর্ণতা ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব যদি ধনী ও বিত্তবানরা চায় যে, দরিদ্ররা আল্লাহ্‌তাআলার এ আদেশ পালন করুক অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ জবরদখল না করার যে নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাহলে তাদেরও (অর্থাৎ ধনীদের) কর্তব্য তারাও আল্লাহ্‌তাআলার এ নির্দেশ যেন পালন করে এবং নিষ্ঠার সাথে এর প্রতি কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়। পৃথিবী থেকে পরমুখাপেক্ষিতা দূর করার লক্ষ্যে এবং একে নিম্নতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌তাআলার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে তাদেরকে সে নির্দেশই দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সবচে' বড় সমস্যা হল ধন-সম্পদের অসম বন্টনের বিষয়টি। একটি গোষ্ঠী যেমন প্রাচুর্যের মাঝে গড়াগড়ি যাচ্ছে তেমনি একটি গোষ্ঠী চরম দারিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এ আকাশচুম্বি ব্যবধানের কারণে উভয় গোষ্ঠীর মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। আর এভাবেই এদের মাঝে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের স্পৃহা বারে বারে অস্থিতিশীল অবস্থা ও বিপ্লবী স্লোগানের শিকারের কারণে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ব এখন পর্যন্ত এথেকে মুক্তি লাভ করতে পারে নি। একদিকে পুঁজিবাদীরা নিজেদের পুঁজির জোরে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে আর অন্য দিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মূল্য পাওয়ার চেষ্টায় ধুকে ধুকে মরছে আর তাদের সঠিক পরিশ্রমের মূল্যও তারা পাচ্ছে না।

ধনী-দরিদ্রের এ ব্যাপক সমস্যা সমাধানের উত্তম মাধ্যম হলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অভ্যাস থেকে এ আবেগ জাগ্রত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, প্রত্যেকের সঠিক অধিকার লাভ করা আবশ্যক। আর কাউকে লুটতরাজের অধিকার ও কারও মাঝে বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত নয়। ইসলাম যেখানে (আল্লাহ্‌র পথে) অর্থ ব্যয়ের ভরপুর আহ্বান জানিয়েছে সেখানে এর উদ্দেশ্যও নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ব্যয় করেন যিনি তার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ। এর পেছনে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য কাজ করে না। নইলে আত্ম-তুষ্টি, লালসা, অবৈধ আয়ের প্রলোভন আর অন্যদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলে অহমিকাপূর্ণ কুঅভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ কষ্টকর হবে। আর সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না যার লক্ষ্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে এতটা তাগিদপূর্ণ আহ্বান জানানো হয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনাকে স্থায়িত্ব দান করণ আর একে অনায়াসে প্রবাহমান রাখার জন্যে ইসলাম স্বল্পে-তুষ্টতা ও আনুষ্ঠানিকতামুক্ত সাদাসিদা জীবন অবলম্বন করার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। আর অপচয়ের পথ পরিহার-**লাতুসরিফু ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মুসরিফীন**–তোমার অপচয় করো না; নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্)অপচয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না (সূরা আন আনআমঃ১৪২)-করার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, আনুষ্ঠানিকতা বা লৌকিকতার পথ অসংখ্য। মানুষ যদি এতে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে কারুনের ধনভান্ডারেও কুলোবে না। আর ব্যক্তিগত ব্যয় এতই বেড়ে যেতে থাকে যে, মানুষ লৌকিকতার শিকার হবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের জন্যে তার প্রাণে কিভাবে উৎসাহ সৃষ্টি হবে আর সেজন্যে সে কিভাবেই বা সাহস দেখাবে?

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের শ্রেণীভেদ

ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অপর নাম সদকা। আর সদকার কয়েকটি শ্রেণীভেদ রয়েছে, যেমন ঃ

(১) জাতীয় ও সার্বজনীন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা। এর জন্যে প্রয়োজন একটি শর্ত।

সার্বজনীন ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিলে আর ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে দাবী করা হলে, যার কাছে যা আছে তা নিয়ে আসুক যেন এ ক্ষয়-ক্ষতির মোকাবেলা করা যায়। তখন যার কাছে যা আছে তা নিয়ে উপস্থিত হওয়া সকলের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় । ঐশী নির্দেশ হলো ঃ **ইন্নাল্লাহাশ্‌তারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুসাহুম ও আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ এ অঙ্গীকারের বদলে ক্রয় করে নিয়েছেন যেন তাদের জান্নাত লাভ হয় (সূরা তাওবা ঃ১১)। এতে এ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) সঞ্চয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ থেকে ব্যয় করা। এর আবার দু'টি শ্রেণী রয়েছে ঃ (ক) মানুষ স্বেচ্ছায় নিরুপণ করে এমন ব্যয়। যেমন ঐচ্ছিক সদকাসমূহ যেসব মানুষ অভ্যন্তরীণ তাক্‌ওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়। অনুগ্রহের বদলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, উপহার ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের খাতিরে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ও ঐচ্ছিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) লাযেমী বা অবশ্য দেয় চাঁদা, একজন মুসলমান সাধারণত যা ব্যয় করতে বাধ্য, যেমন সামগ্রিক অবশ্য দেয় চাঁদাগুলো যা সাধারণ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ইসলামের প্রচার কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আহূত মজলিসে মুশাভিরাত (পরামর্শ সভা) প্রস্তাব করে এবং যুগ-খলীফা এর অনুমোদন দেন।

(গ) সরকারের পক্ষ থেকে প্রবর্তিত ট্যাক্সসমূহ এর অধীনে আসে।

(ঘ) এছাড়াও নিকটবর্তী লোকদের জন্যে ব্যয় , সেবার দায়িত্ব পালন, ঈদুল ফিতরের সদকা, ফিদিয়া, কাফ্‌ফারা ও নযর বা মানত সম্বন্ধীয় ব্যয়ও দেয় চাঁদার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) আল্লাহ্‌র পথে একটি আবশ্যিক খরচ এর বিশেষ ও পরিভাষাগত নাম যাকাত। আর এ ব্যয়ের বিস্তারিত কথা এখন দৃষ্টিপটে রয়েছে ঃ সঞ্চয় থেকে আবশ্যিক খরচের মাঝে যাকাত সবচে' বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কেননা, এটা আল্লাহ্‌র পথে নিম্ন পর্যায়ের ব্যয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে প্রত্যেক 'সাহেবে নিসাব' মুসলমানের জন্য এটা ব্যয় করা ফরয। সমাজের এটা প্রয়োজন হোক বা না হোক অবশ্যই এ ব্যয়টি জরুরী। এ কারণেই যাকাতের আদায় সেই সময়ও প্রয়োজনীয় হবে যখন সমাজের সব রকমের জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন অন্য মাধ্যমে সহজে পূরণ হতে থাকবে। কেননা, এ অর্থ ব্যয় প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির ব্যয় করার অভ্যাসটা চিরস্থায়ী হয়। সংকীর্ণতা, কৃপণতা ও ঈর্ষার মূলোৎপাটন হতে থাকে। আর ঐশী বাণী **কাইলা ইয়াকূনা দূলাতাম্ বায়নাল আগনিয়া-ই মিনকুম** (সূরা হাশ্‌র ঃ ৮) অর্থাৎ যেন এটা তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়– এর উদ্দেশ্যাধিত হয় আর সমাজে জালেম ও কৃপণ ব্যক্তিদের শোষণ থেকে সুরক্ষা লাভ করে।

যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য

ইসলাম টাকা-পয়সা আয় করতে নিষেধ করে নি। অবশ্য টাকা-পয়সা আটকে রাখতে বা খরচ না করতে নিষিদ্ধ করেছে। এরপরও যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যত প্রয়োজনের খাতিরে সাবধানতাবশত কিছু অর্থ সঞ্চয় করে আর পড়ে থাকতে থাকতে অনেকটা বছর এভাবে কেটে যায় তাহলে টাকা-পয়সার ওপর যাকাত প্রদান অবশ্য-কর্তব্য হয়ে যাবে। এর প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন–

খুয্ মিন আমওয়ালিহিম সদক্বাতান তুত্বাহহিরুহুম তুযাকীহিম অর্থাৎ (হে রসূল!) এদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করো এভাবেই ওগুলো পাক এবং ওগুলোর পবিত্রতার উপকরণ সৃষ্টি করে দেবে (সূরা তাওবাঃ ১০৩)

যাকাতের ধন-সম্পদ

যাকাতের ধন-সম্পদ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। গুপ্ত ধন-সম্পদ ও বাহ্যিক ধন-সম্পদ। গুপ্ত ধন-সম্পদ নগদ অর্থ, সোনা-রূপা যে আকারেই হোক না কেন, অলংকারাদি হোক বা ব্যবহৃত আর কোন জিনিস হোক।

(ক) বাহ্যিক ধন-সম্পদ ঃ গবাদি পশু । যেমন উট, গাভী, মোষ, ভেরা, ছাগল জাতীয় পশু। শর্ত এই যে, বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত বা এজমালী গ্রাম্য স্থানে চরে খায় আর এদেরকে বেঁধে রীতিমত খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।*

(খ) জমিতে উৎপন্ন ফলাদি। যেমন , গম, যব, জোয়ার, ধান-চাল, বজরা, খেজুর, আঙ্গুর, বনের মধু যা কেউ সংগ্রহ করেছে।**

(গ) যেসব ধাতব পদার্থ ব্যক্তির নিকট মজুদ আছে যেমন, লোহার খনি, তামার খনি, টিনের খনি, তেলের খনি প্রভৃতি।

(ঘ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত সম্পদ ঃ শিল্প কারখানার ব্যবহৃত পূঁজি।

(ঙ) বাহ্যিক ধন-সম্পদ থেকে আসলে যাকাত সংগ্রহ করার অধিকার সরকারের। এর কারণে যে, যেসব জমি থেকে সরকার রাজস্ব আদায় করে বা যেসব শিল্প-কারখানার প্রতি ইনকামট্যাক্স (আয়কর) আরোপ করে এর ওপর অতিরিক্ত যাকাত নেই; কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে সরকারী ট্যাক্স যাকাতের নির্ধারিত হার থেকে কম।এক্ষেত্রে যে পার্থক্য এর হিসেবে নিজ থেকে অথবা সরকারের দাবী অনুযায়ী সানন্দে যাকাত আদায় করা কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ আর পুণ্যেরও কারণ।

(চ) গুপ্ত ধন-সম্পদের তদারকি সরকারের পক্ষ থেকে হতে পারে না। যেভাবে জমাকৃত নগদ অর্থ মূল্যবান অলংকারাদি, বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর পদ্মরাগ, জমরূদ (এক প্রকারের মূল্যবান সবুজ পাথর)। এসব সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা একজন সত্যিকারের মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। এ যাকাত গরীব মিসকিন অভাবী ব্যক্তিদেরকে স্বয়ং নিজের ইচ্ছায় দিতে পারে আর ধর্মীয় আঞ্জুমান ইশাআতে ইসলামের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসাদির মাধ্যমেও বন্টন করা যেতে পারে। অধিকতর উত্তম ও প্রত্যেক দিক থেকে কল্যাণকর পদ্ধতি

* ঘোড়া এবং গাধা কি যাকাতের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর যাকাতের শর্ত কী এ প্রশ্নও বিতর্কের বিষয়।

** এ প্রশ্নও ওঠে যে, অন্যান্য নগদ অর্থ ও ফসল যেমন, কার্পাশ, তুলা, আখ, তৈলবীজ, রবার, বিভিন্ন সব্জী, তরমুজ, খরমুজ,বুট, শসা, বিভিন্ন ফল যেমন আপেল, আম, মাল্টা, কিন্নু, কমলা জাতীয় ফল,কলা, বাদাম, আখরোট,পেস্তা, টলগোজা প্রভৃতি এসব উৎপন্ন দ্রব্যের ওপরে যাকাত দিতে হয় কি হয় না এ বিষয়ও দৃষ্টিপটে নিয়ে আসা যায় এবং কিয়াসের নীতির ভিত্তিতে কাজ করে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

এই, এ ধরনের সবটা যাকাত যেন যুগ-খলীফার কাছে পাঠানো হয় যাতে গোটা জামাতের গরীব মিসকীন ও অভাবীদের এ সম্পদ থেকে অংশ লাভ হয়। কারণ এটাই, উম্মতের সব আলেম এ নিয়মকে স্বীকার করেছেন। যাকাত বন্টন করা যুগ-ইমামের অধিকার (তশরীহে যাকাত, পৃষ্ঠা ১৩৬)।

যাকাতের আবশ্যক শর্তাবলী

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলাদি যেমন, বিভিন্ন প্রকারের শস্য, খেজুর, আঙ্গুর, মধু, এদের বেলায় তখন যাকাত অবশ্য দেয় হয় যখন এগুলো পাকার উপযুক্ত হয় আর এর নিসাব পূর্ণ হয়। এরপর এ উৎপন্ন দ্রব্য যত বছরই পড়ে থাকুক না কেন এর ওপর যাকাত প্রবর্তিত হবে না।

অন্য রকমের সম্পদ যেমন নগদ অর্থ, সোনা, রূপা, ব্যবসায়ের মালামাল, গবাদি পশু এগুলোর ওপরে যাকাত তখন অবশ্য-কর্তব্য হবে যখন তা নির্ধারিত নিসাব-এর সমান হয় আর সারা বছর অধীনে থাকে। যত বছর অধীনে থাকবে প্রত্যেক বছর এগুলোর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে। গবাদি পশুর জন্যে একটি বিশেষ শর্ত এটাও। এরা বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত্র, জঙ্গল এবং গ্রাম্য চারণ ক্ষেত্রে চরে আর এর ওপর তাদের জীবন নির্বাহ হয়, তাদের স্বয়ং খাবার দিতে হয় না। তদুপরি ওগুলো হালে জোতার এবং বোঝা বহনের কাজেও লাগে না।

গবাদি পশুর যাকাত প্রকৃতপক্ষে এমন দেশ ও এলাকার সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে বিস্তীর্ণ চারণ ক্ষেত্র সহজে পাওয়া যায়। সেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ ভেড়া-বকরী ও গাভী পাওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন ও দুধ বা মাংস রপ্তানী করা হয়ে থাকে অথবা কোন প্রকারের অন্যান্য ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পেশা হিসেবে পশু পালন করা হয়ে থাকে।

যাকাতের নিসাব ও নিয়মাবলী

নগদ অর্থ, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য সব রকমের মূলধনের জন্যে নিসাবের নিরিখ হলো রূপা অর্থাৎ যার নিকট ৫২ তোলা ৬ মাসা অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে বা এত রূপা বা সোনা থাকে যা দিয়ে এ পরিমাণ রূপা কেনা যায় তখন এর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। যাকাতের বিষয় হলো পুরো মূলধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা আড়াই (২.৫%)শতাংশ যেমন, ৫২ তোলা ৬ মাসা রূপার মূল্য যদি ১০,৫০০ টাকা হয় আর এত অর্থ তার নিকট থাকে তাহলে ২.৫% হিসেবে নিশ্চিত তাকে১৬২.৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

"এটা সেই সম্পদের যাকাত যার জন্যে নিসাবের নিরিখ রূপা আর নিসাবের নিরিখ জানার জন্যে ওজন হলো মাধ্যম।

মহিলাদের বক্তিগত ব্যবহারে থাকে এমন সোনা ও রূপার অলংকারাদির বেলায় এবং কখনও কখনও চাওয়ার পরে তারা গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয় এর ওপর যাকাত হবে না। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, 'যে অলংকার ব্যবহারে রয়েছে এর যাকাত নেই।' আর রেখে দেয়া হয় এবং কখনও কখনও পরা হয় এর যাকাত দেয়া আবশ্যক। যে অলংকার পরা হয় আর কখনও কখনও দরিদ্র মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়, কোন কোন লোকের এ ব্যাপারে ফতওয়া এই যে, এর যাকাত নেই। আর যে অলংকার পরা হয় এবং অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়া ভাল। কেননা, এ নিজের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের ঘরে এর ওপর ও নিজেদের বর্তমান অলংকারের ওপর যাকাত দেয়া হয় আর যে অলংকার টাকা পয়সার মত রাখা হয় এর যাকাত দেয়ার প্রসঙ্গে কারও মতভেদ নেই" (মযমুআ ফাতাওয়া আহমদীয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল্ হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৫)।

ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর যাকাত আদায় করার আসল অধিকারী যদিও সরকার আর নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা ট্যাক্সের পরিমাণও নির্ধারণ করেন। তবুও দিক-নির্দেশনার জন্যে উম্মতের আলেমগণ মূলধনের ওপর যাকাত নির্ধারণের যে নীতি প্রস্তাব করেছেন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে অপকার হবে না।

শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে কেবল সেই মূলধনের ওপর যাকাত প্রদেয় যা ব্যবসায়ের আবর্তনে রয়েছে অর্থাৎ মালামাল আনতে ও মালামাল বিক্রি করতে ও মালামাল তৈরী করতে হয়। যে পুঁজি বিনিয়োগকৃত কারখানার মেশিনারী, দালান-কোঠা, প্রয়োজনীয় অফিসাদি, ফার্নিচার ও হিসাব কিতাবের রেজিষ্টার বই খাতা এবং ফাইল ইত্যাদিতে ব্যয় হয়েছে এর ওপর যাকাত প্রদেয় হবে না। এভাবে বাস, ট্রাক, টেক্সি ও ভাড়া দেয়ার নিমিত্তে নির্মাণকৃত দোকান-পাট ও ঘর-বাড়ী নির্মাণের ব্যয়কৃত মূলধনও যাকাত থেকে রেয়ায়েত হবে। এমনিভাবে এসব জিনিষ যা মানুষের আসল প্রয়োজন মিটাতে ব্যয় হয় যেমন থাকার বাড়ী, পরার কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র, ফার্নিচার, আসা-যাওয়ার গাড়ী, লাইব্রেরীর পুস্তক ইত্যাদি-এর যতই মূল্য হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ টাকারই হোক না কেন এর ওপরও যাকাত প্রদেয় হবে না।

মোটকথা যাকাত চলমান ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর। যাকাতের হিসাব এভাবে হতে পারে। যত টাকা যে যে মাসে ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয় তত টাকা সেই সেই মাসে উল্লেখ করে সবটা একত্র করে নেয়া হয় আর ১২ দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা বের হয় এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হয়। যেমন, ২৫০.০০ টাকা বছরের প্রথম ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ পর্যন্ত বার মাস ঘটলো। ২ মাস পরে ২০ টাকা আরও বিনিয়োগ করা হলো যা ১০ মাস ব্যবসায় ঘাটলো। এর ২ মাস পরে ৫০০.০০ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে হিসাব করা হয় ২৫০.০০ টাকা ১২ মাস, ২০.০০ টাকা ১০ মাস, ৫০০.০০ টাকা ৮ মাস খাটানো হয়েছে। এজন্যে

টাকা	মাস	মোট
২৫০ x	১২	=৩,০০০
২০ x	১০	= ২০০
৫০০ x	৮	= ৪,০০০
		৭,২০০/-

সমস্ত বিনিয়োগকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,২০০/= টাকা। একে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ৭,২০০/=÷১২=৬০০/=। এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ১৫/= যাকাত ধার্য হবে। (চলবে)

অনুবাদ –মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

রমযানের রোযা জিহাদে আকবর

(আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক এবং নৈকট্য লাভের এক সফর)

একটি উঁচু পর্যায়ের জীবন আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেকে এ দুই প্রকারের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করলে শুধু একজন মানুষের স্থায়ী জীবন নয় বরং সমষ্টিগতভাবে জাতিগত জীবন স্থায়ীত্ব লাভ করে। এমনই জীবন মানুষকে আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করিয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের সফরকে সহজ করে দেয়। যখন একবার বাহ্যিকভাবে মু'মেনদের জামাত বিপদ থেকে রক্ষা পায় এবং বিশৃংখলা ও ফিৎনা চলে যায় তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"তোমরা ছোট জিহাদ থেকে জিহাদে আকবর (বড় জিহাদের) দিকে এসেছ"। অর্থাৎ যদি জেহাদের ইচ্ছা খোদাতাআলার তকদীর হয় তাহলে জিহাদ বিল নাফস (আত্মার জিহাদ) ও তাঁরই এক তকদীর।

মানুষের জীবনে জিহাদ পরস্পর যুক্ত এক নাম, সে সম্মানিত প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এর মধ্যে দৃঢ়তা দেখায়। তার দৃঢ় পদক্ষেপে সামান্যতম পদচ্যুতি আসে না। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার জন্য তাঁর ইবাদত, মালী কুরবানী, উত্তম আখলাক এবং সত্য ধর্মের দাওয়াত ও প্রচার সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র নৈকট্যে অর্জনের মাধ্যম হয়ে যায়। এই ইবাদতই যার থেকে উচ্চ পর্যায়ের আখলাক সৃষ্টি হয় এবং এরকম চরিত্র থেকেই উপকারী সাধকের সত্তা তৈরী হয়। আর প্রকৃতপক্ষে এরকমের প্রাথমিক পর্যায়ের ইবাদত থেকেই উত্তম চরিত্র ক্রমোন্নতি পেয়ে তা কল্যাণ প্রাপ্ত সত্তায় পরিণত হয়।

রমযানুল মোবারকে রোযার ইবাদত প্রকৃতপক্ষে জিহাদ বিল নফস (আত্মার জেহাদ) অথবা জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যার শিক্ষা মু'মেনদের জন্য একটি অনেক বড় এহসান (অনুগ্রহ)। সূরা বাকারাতে আছে–ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিনকাবলিকুম লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন। (আয়াত-১৮৪)

হে মু'মেনরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেইভাবে সেই সমস্ত লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল যারা তোমাদের পূর্বে ছিল যেন তোমরা (চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক দুর্বলতা থেকে) রক্ষা পাও।

রোযা আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন একটি মাধ্যম যার হুকুম কোন না কোন ভাবে পূর্বের জাতিদেরকেও দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকে যেরূপে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এর মাঝে উচ্চ মর্যাদা আছে? হ্যা, অবশ্যই আছে, এই ইবাদতে শাররীক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক জীবন এবং ক্রমোন্নতির রূপ বিদ্যমান যা আর অন্য কোন জাতিতে বিদ্যমান নাই। এর কিছু চিত্র সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

রমযানের রোযার হিকমত (প্রজ্ঞা) এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন"। অর্থাৎ তোমরা প্রকাশ্য এবং আভ্যন্তরীণ পাপ থেকে বাঁচ। সুতরাং বাহ্যিক বিশ্বাসের সাথে সমস্ত বছরে এক মাসের ফরয রোযা, তার আদব ও শর্তের সাথে (আদায় করলে) শারিরীকভাবেও অনেক উপকার। মানুষের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। আর সে যে কোন পরীক্ষার কঠিন অবস্থাকে মুহূর্তের মধ্যে মোকাবেলা করতে পারে।

মানুষের ভাল স্বাস্থ্যের কারণ তার শরীরের প্রয়োজনমত খাবার সময়মত নেওয়া। কোন সময় খাবার না খাওয়া ও তার শরীরের জন্য প্রয়োজন হয়। যার থেকে শরীরের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিস যা দুর্বল এবং অসুখের কারণ হয় ধ্বংস হয়ে যায়। রোযার বহ্যিক উপকারের মধ্যে এই অভিজ্ঞতাও সামনে আসে যে, কিছু ব্যথা রোগ-ব্যাধি ও রোযার কারণে দূর হয়ে যায়।

রোযার প্রভাব সাধারণতঃ মানুষের আখলাকের উপরও পরে। যখন সে স্বয়ং রোযার কারণে কষ্ট সহ্য করে তখন তার হৃদয়ে/মনে গরীব এবং মুখাপেক্ষীদের কষ্টের বিষয়টি অনুভূত হয়। আর এই অনুভূতিই তার ভিতরে অভাবী এবং মুখাপেক্ষীদের প্রতি সহানুভূতি ও কল্যাণকামীর আখলাক সৃষ্টি করে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের দিনগুলোতে অধিক হারে সদকা খয়রাত করতেন। হাদীসে এসেছে রমযানের দিনগুলোতে তিনি (সঃ) দ্রুত চলাকারী ধুলো ঝড়ের মত সদকা করতেন। সদকা খয়রাত ছাড়াও রমযানের ফিদিয়া, রোযার সেহেরীও ইফাতারে অভাবীদের প্রতি খেয়াল, ফিতরানার শিক্ষা এর নিয়ম কানুনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাই হোক মানুষের সামাজিক এবং পারস্পরিক জীবনের উপরও রোযার ইবাদতের গভীর প্রভাব পড়ে।

"লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন" এর মধ্যে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, রোযার ফলে দৃঢ়তা অর্জন হয়। মানুষ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্থান পায়। কুরবানী দেওয়াকারী ধনীরাই শুধু আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করে না বরং গরীবরাও নিজেদের ভিতরে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন অনুভব করে। আল্লাহ্‌তাআলা রমযানের রোযায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, যদিও তোমরা অনেক সময় অভুক্ত /ক্ষুধার্ত থাক কিন্তু রমযানের রোযা শুধু আমার জন্য রাখ। হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন–"আসসাওমুলি ওয়া আনা আজযি বিহি.....(বুখারী কিতাবুস সাওম), আমার বান্দা আমার জন্য রোযা রাখে সুতরাং তার প্রতিদান আমি স্বয়ং তৈরী করবো অর্থাৎ তারা আমার সাক্ষাৎ করতে চায় আর আমি তাদের নিজের দর্শন করাব। এভাবে আল্লাহ্‌তাআলা ফকীর এবং অভুক্ত জীবন অতিবাহিতকারীদেরকে এ ফরমূলা বলেছেন, যদি তারা এমন জীবনকে আল্লাহ্‌র জন্য পালন করে তাহলে তারা আল্লাহ্‌তাআলাকে পেয়ে যাবে। আর ধনীদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার সমস্ত জিনিস লাভ করা সত্ত্বেও যদি তারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য "সায়েম" (রোযাদার) এর জীবন অতিবাহিত করে এবং দুনিয়া ছিন্নকারী জীবন অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে নিজের নৈকট্য অর্জন করাবেন।

রোযার ইবাদতের মধ্যে এই হিকমতও আছে এটা প্রত্যেক ধরনের নিচু এবং নিম্নস্তরের জীবন থেকে রোযাদারকে সুরক্ষিত রাখে। এভাবেই "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুনের" উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং রোযার আদব এবং শর্তের উল্লেখ হাদিসে আছে–

(১) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযাদার হয় তাহলে সে যেন বেহুদা কথা না বলে, গোলমাল না করে, যদি তাকে কেউ গালিগালাজ দেয় অথবা মারামারি ঝগড়া হয় তাহলে সে যেন উত্তরে বলে আমি রোযাদার। (বুখারী কিতাবুস সাওম)

(২) যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং এর উপর কর্ম করা থেকে বিরত থাকেনা (তাহলে) আল্লাহ্‌তাআলার তার ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকার কোন প্রয়োজন নাই।

যাই হোক যেখানে প্রত্যেক ধরনের দুর্বলতা এবং গুনা থেকে বাঁচার প্রকৃত শিক্ষা রোযা সুস্পষ্ট করেছে যেখানে রোযাদারের জন্য এই সমস্ত গুনাহ্‌র আক্রমণের সামনে রোযা একটা ঢাল হয়ে যায় এটাই প্রকৃত রোযা।

মোটকথা মু'মিন রোযার ইবাদতে দৃঢ়তা, দৃঢ় পদক্ষেপ, দোয়ার প্রভাবের সৌন্দর্য অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়। আর ঈমান এবং হিসাবের সাথে রমযান থেকে কল্যাণমন্ডিত হয় তখন তার জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দরজা খুলে যায়। যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে "ফুতিহাত আবুওয়াবুল জান্নাতি", তার জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দরজা খুলে দেওয়া হয়। এটাই জিহাদ বিল নাফস (আত্মার জিহাদ), জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) যার পরিণামে নফসে মুতমাইন্নাহ্ এর শান্তি এবং রহমতের স্থান অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ভালবাসার দিকে ডাকা হয়।

মূল-**নসরুল্লাহ খান নাসের**

অনুবাদ ঃ **রইস আহমদ**, মুরব্বী সিলসিলাহ্

খেলাফত–ইসলামের সঞ্জীবনী ব্যবস্থা

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমান রয়েছে বলে জানা যায়। সাধারণভাবে মুসলমানরা দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত –যারা শিয়া ও সুন্নী নামে অতি পরিচিত। যারা নবীনেতা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনে বিশ্বাস করে না, হযরত আলী (রাঃ) কে অনুসরণ করে–হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)এর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলীফা হিসাবে মানে না– তারা 'শিয়া' নামে অভিহিত। আর যারা খোলাফায়ে রাশেদীনের এতায়াত করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সুন্নতকে (কার্যাবলী) অনুসরণ করে আসছে তারা 'সুন্নী'। কিন্তু ইসলাম আজ শুধুমাত্র এ দুর্ণামের পরিচিতি নিয়ে বসে নেই। সময় ও পছন্দ-অপছন্দ এবং স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ দু'দল আবার অনেক দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এমনি করেই বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সবগুলো ছোট দলের অবশ্যই এক বা একাধিক নেতা রয়েছে। এ নেতাগণ নিজেদেরকে ধর্মীয় প্রতিনিধি বা পন্ডিত ভাবেন এবং এভাবে কিছু অজ্ঞ লোকদের মাঝে নিজেদেরকে জাহির করছেন। বর্তমানে ইসলামের এ চলমান অবক্ষয় আমাকে অন্ধের দুধ পান করার গল্প মনে করিয়ে দেয়। কোন এক অতীতে কোন বন্ধুর কাছ থেকে গল্পটা শুনেছিলাম। গল্পটা এরূপ–এক লোক কিছু দুধ এনে এক অন্ধকে বল্ল, তোমার জন্য দুধ এনেছি–তুমি দুধটুকু পান করে ফেল। অন্ধটি জন্মান্ধ; সে কোন দিন দুধ দেখেনি, আর যে কোন কারণেই হোক, তার জীবনে সে কোন দিন দুধ পান করেনি। তাই অন্ধ লোকটাকে বল্ল–ভাই, দুধ কি রকম বা কি জিনিস? লোকটি বল্ল, দুধ বকের মত সাদা তরল, পুষ্টিকর খাদ্য। এটা পান করলে শরীরে বল হয়। অন্ধ বল্ল, বক কি রকম? লোকটা বল্ল, বক এক প্রকার পাখী, তার দু'টি লম্বা লম্বা ঠ্যাং আর লম্বা ঠোঁট থাকে। অন্ধ বলল, বক লম্বা ঠোঁট দিয়ে কি করে, লোকটা বল্ল, বক লম্বা ঠোঁট দিয়ে নদী-নালায় ছো' মেরে মাছ উঠিয়ে খায়। তখন অন্ধ বল্ল, বক যদি ঐ লম্বা ঠোঁট দিয়ে আমার চোখে ঠোঁকর মারে? তা'হলে আমি বাচব না। ভাই, আমি এমন দুধ পান করব না। সুধী পাঠক! হয়ত ভাববেন, এ কেমন বেখাপ্পা গল্প? আমি এ গল্পটা আপনাদের এজন্য শুনালাম যে, বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা মূলকে বাদ দিয়ে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় কতিপয় নতুন নতুন মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ইসলামে খেলাফত এক সঞ্জীবনী অপরিহার্য ব্যবস্থা। অথচ এ ব্যবস্থা সম্পর্কে একমাত্র আহমদীয়া জামাত ছাড়া কারো স্পষ্ট ধারনা নেই। আলেম-ওলামারা এ ব্যাপারে মুখ খুলেন না, সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ বিষয়ে অবহিত করতে পারছেন না। সারা বিশ্বের অধঃপতিত শত কোটি মুসলমানদের ঈমানের পুষ্টি যোগাতে, জীবনী শক্তি ফিরিয়ে দিতে একমাত্র খেলাফতই যে সক্ষম এবং যথার্থ তা' কেউ অনুধাবন করছেন না। আলাপচারিতায় দেখা যায়, কেউ কেউ মনে করেন, খেলাফত কায়েম হলে খলীফাই রাষ্ট্রপ্রধান হবেন। আবার কেউ কেউ আরবের কোন কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরকেও খলীফা ভাবেন–বা বলেন। আবার দেখা যায়, পীর-মাশায়েখদের খলীফা থাকে। তাঁদের মাঝে অনেকে নিজেদেরকে নায়েবে রসূল (হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর প্রতিনিধি) বলেও জোর গলায় দাবী করেন। আজকাল তো নেংটা, জটধারী ফকীর সাইদেরও খলীফা থাকে। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে আবার টেইলার বা দর্জিদেরকে খলীফা বলা হয়। কাজেই, এসব লেবেল ধারীদের কাছে বিশ্বের একজন খলীফা থাকে বিষয়টা তো চিন্তা চেতনার উর্ধ্বে।

পৃথিবীর যে সব দেশে অধিক সংখ্যায় মুসলমান বসবাস করে, সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলন করে খলীফা বানানোর চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত ওই রাজনৈতিক দলের প্রধানকে 'আমীরে শরীয়ত' নামকরণ করে। কেন জানি আমার কাছে এহেন বিষয়টা অদ্ভুত ঠেকে ; কেননা, যেখানে ইসলামের প্রধান 'আমীরুল মু'মিনীন' হওয়ার কথা– সেখানে আমীরে শরীয়ত' বানানোটা দুধের বদলে ভেজাল দুধের ঘোল খাওয়ার মত। পবিত্র আল-কুরআন শেষ শরীয়ত সেখানে সূরা নূরে 'আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন–"ওয়াদাল্লাহুল্লাজিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাতে লা' ইয়াস্ তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদে কামাস্ তাখলাফাল্লাজিনা মিন কাবলিহুম।" অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে পূর্ববর্তী নবীদের মৃত্যুর পর তাদের উম্মতে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের ন্যায় তিনি মুহাম্মদ (সঃ)এর উম্মতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন- (রুকু-৭, আয়াত ৫৬)। এ ব্যাপারে হাদীস পাঠেও জানা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন নবী গত হননি-যাঁর পর খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয়নি। স্বয়ং হযরত রসূল (সঃ) বলেন, "মা কানা নবুওয়াতুন কাওইল্লা তাবিয়াত হা খিলাফাতুন" (কনজুল উম্মাল, জিলদ-৬ পৃঃ ১২৬) অর্থাৎ প্রত্যেক নবুওয়তের পরই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের খলীফাকে বলা হয়, "খলীফাতুর রসূল"। অথচ খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিজের ওফাতের পর চার জন খলীফা নির্বাচনের পর খিলাফতের ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হলো। ইসলামের ইতিহাস বলে, যদিও মুয়াবিয়া নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করেছিল। এরপর খিলাফত বাদশাহাতের আওতায় চলে, এ ধারায় খিলাফত দামাস্কাস, বাগদাদ, কায়রো, ও কর্ডোভার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সবশেষে ১৯০৮ সালে তুরস্কের সুলতান ২য় আব্দুল হামিদের হাতে পরিসমাপ্তি ঘটে। আর উম্মতে নায়েবে রসূল, ধর্মের ব্যাখ্যাকারী, প্রত্যায়ণকারী ওলামা-মাশায়েখরা নিজেদের ব্যবসা চালানোর উদ্দেশ্যে খিলাফতের বিষয়ে কোটি কোটি মুসলমানকে মেঘাচ্ছন্ন করে ইসলামে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করল। আর আল্লাহ্র ওয়াদা এভাবেই মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হলো (নাউযুবিল্লাহ্)। কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াদা সম্পর্কে আমরা মেঘাচ্ছন্ন মুসলমানরাও প্রত্যেক ওয়াক্তিয়া নামাযের আযানের দোয়ায় বলি, ইন্নাকা লা' তুখলিফুল মিয়াদ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) কোন ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

তাহলে, এবারে অবশ্যই প্রশ্ন–তা'হলে ইসলামে সে খলীফা কোথায়? বিশ্বের দেশে দেশে রাজনৈতিক দল গড়ে আন্দোলন করে কি খলীফা বানানো হবে? এখন যদি এরূপ

রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তুরস্কে আন্দোলন হয়, যদি হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে আন্দোলন হয়, যদি পাকিস্তানে এমনটি হয়, আর প্রত্যেক দেশেই যদি একজন করে এ পদ্ধতির খলীফা নির্বাচিত হন, তাহলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মুসলমানরা বিনা দ্বিধায় অন্য দেশের রাজনৈতিক দলের সমর্থিত কোন এক দেশের খলীফাকে ইসলামের খলীফা হিসাবে গ্রহণ করবে বা এ খলীফা কি বিশ্বের মুসলমানদেরকে 'উম্মতে ওয়াহেদা'বানাতে সমর্থ হবে?

কুরআন মজীদের সূরা নূরের ওয়াদার পাশাপাশি সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ্‌র নির্দেশ "এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (আয়াত-১০৪)। তাকে শক্তভাবে ধরে থাকতে হবে, বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। যারা শরীয়তের প্রধান ধর্মের সার্টিফিকেট ইস্যুকারী এসব মহান ব্যক্তিরা কি এ আদর্শ মেনে ইসলামের বিভাজন রুখবেন? আর তা' না হলে কিভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্নতাকে রোধ করা হবে? অথচ সূরা নূরের 'আয়াতে ইস্তিখলাফ'এর ব্যাখ্যায় ইমাম ফকরুদ্দিন রাযী লিখেছেন. "যেভাবে হারুন, ইয়াশাওয়া, দাউদ এবং সোলায়মানকে খলীফা করেছিলেন সেভাবে এ উম্মতেও (উম্মতে মুহাম্মদীয়া) তিনি খলীফা করবেন (তফসীরে কবীর যিল্‌দ-৬ পৃষ্ঠা ৪২৯)। এ উম্মতের অনেক আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ যদিও মন্তব্য করেন–খলীফাহীন ইসলাম কর্ণধারবিহীন তরীর তুল্য, বিপন্ন লক্ষ্যভ্রষ্ট; তথাপি এ আলেম সমাজ খেলাফত বা খলীফা সন্ধানের বিষয়ে প্রচন্ড উদাসীন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলে গেছেন, "খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়ত"–নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে (মিশকাত)। এ খেলাফত প্রতিষ্ঠাকারীকে তিনি (সঃ) "খলিফাতাল্লিল মাহদীয়া" বলে উল্লেখ করেছেন (আহমদ, হায়হাকী, ইবনে মাজা)। ইমাম মাহদীর (আঃ) খিলাফত পূর্বদেশে কায়েম হবে বলেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

সুপ্রিয় পাঠক! হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে এবং পূর্বদেশে এ খেলাফত কায়েম হয়েছে। বিশ্বের ত্রিশ কোটি মুসলমান আজ আল্লাহ্‌র ওয়াদা মোতাবেক ও খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে বর্তমান শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) দ্বারা 'খিলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়ত, এ রজ্জুকে শক্তভাবে আকড়ে ধরে রেখেছে। এ খিলাফতের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় আজ পৃথিবীতে একদল নিষ্ঠাবান, আদর্শ মুসলমান, মুহাম্মদী নবুওয়তের 'খায়রে উম্মত' পৃথিবীর কোন কোন দেশে ধর্মের নামে নির্যাতিত।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ১২৫০ সনের ১৪ই শাবান ইংরেজী ১৮৩৫ সনে হযরত ইমাম মাহদী আল-মসীহ মাওউদ (আঃ) জন্মলাভ করেন। হযরত মূসা (আঃ) এর তেরশত বৎসর পর যেমন এক মসীহের আবির্ভাব হয়েছিল তেমনই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর তেরশত বৎসর পর মসীহ মাওউদের জাহির হওয়ার কথা। তা'ছাড়া, সূরা নূরে বর্ণিত আয়াতে ইস্তিখ্‌লাফের ওয়াদা মোতাবেক খাতামান্নাবীঈন হযরত, মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর মাধ্যমে 'খিলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত' কায়েম হয়েছে।

নবী নেতা হযরত খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর ইন্তিকালের বারশত বছর পর ১৮৩৫ সনে (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে) দামেস্কের ঠিক পূর্বদিকে ভারতের বরফাবৃত শুভ্র হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কারা অঞ্চলের পাঞ্জাব প্রদেশের 'কাঁদায়া' (বর্তমানে কাঁদিয়ান) নামক স্থানে ইমাম মহদী (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। পবিত্র কুরআনেরর সূরা কিয়ামার ৯ ও ১০ নং আয়াতে পুনরুত্থানকালের লক্ষণ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে 'ওয়া খাছামাল কামারু ওয়া জুমিয়াশ শামছু ওয়াল কামার'–অর্থাৎ তখন এক বিশেষ চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে। সে মোতাবেক রমযান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে' অপর গোলার্ধে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর দাবীর পর থেকে ইসলাম আবার এক ধর্মীয় নেতা পেল, কুরআনে বর্ণিত সূরা নূরের আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ ভারতের লূধিয়ানায় [মসীহ (আঃ) এর দাজ্জাল বধের স্থানটির নাম কোন কোন রেওয়ায়েতে 'বাবে লূদ' উল্লেখিত হয়েছে] বয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধ রহিতকারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শেষ যুগে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আহমদ নামের বিকাশ হবে এবং এমন ব্যক্তি আসবেন, যাঁর দ্বারা 'আহমদী' (জামালী) সিফতগুলির প্রকাশ হবে। সুতরাং, এ জন্য এ সম্প্রদায়ের (আমার অনুসারীদের) নাম 'আহমদীয়া সম্প্রদায় রাখা সমীচীন মনে করা হয়েছে (ইশ্‌তেহার ৪ঠা মার্চ,১৯০০ইং)। আল্লাহ্‌র খলীফা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ১৯০৮ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাঁর ইন্তেকালের পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মে, ১৯০৮ ইং তারিখে হযরত আলহাজ্ব হাকীম নূরুদ্দিন (রাঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর জামাতের তথা ইসলামের খলীফা নির্বাচিত হন। এ সময়ে তুরস্কের নামমাত্র খেলাফতের অবসান ঘটে। আহমদীয়া জামাতের খলীফার মাধ্যমে বর্তমানে 'খিলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়ত' কায়েম হয়েছে। বর্তমানে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের ইমাম হযরত আমীরুল মু'মিনীন সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) (৫ম খলীফা)। তাঁর নেতৃত্বে পৃথিবীর ১৮১টি দেশে ইসলাম প্রচার হচ্ছে। প্রায় ২০ কোটি মানুষ এ খেলাফতের নেতৃত্বে পরিচালিত। যদি বর্তমান বিশ্বে ১২০ কোটি মুসলমান ধরা হয়, তাহলে এর এক ষষ্ঠাংশ আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আর বাকী ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ বিভিন্ন দলে উপদলে বহু নেতার নেতৃত্বে চলছে–যাদের কাছে ইসলাম প্রচারের কোন পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা নেই।

যেখানে মুসলমান উলামাদের সূরা নূরে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি মোতাবেক খলীফার সন্ধান করা অত্যাবশ্যক ছিল, সেখানে এ আলেমকুল আজ কুফরী ফতোয়া আর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নবুওয়ত ঠেকানোর জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নিয়ে ব্যস্ত। কুরআনের শিক্ষাকে পিছনে ফেলে নিজেদের মনগড়া মতবাদ কায়েমে তৎপর।

খলীফার সর্বপ্রধান কাজ, মানবাত্মাকে শোধিত করা, পবিত্র করা, মানুষকে খোদা প্রাপ্তির পথে পরিচালিত করা। শান্তি,শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে প্রসারিত হচ্ছে আজ জামাতে আহমদীয়ার আন্দোলন দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে।

খলীফা আমীরুল মু'মেনীন, তিনি সারা বিশ্বের মু'মিনদের নেতা– তাঁর পদমর্যাদা আন্তর্জাতিক। খলীফার কাজ হলো–ওয়ালা মাক্কিনান্নালাহুম দীনাহুমুল্লাজির তাজালাহুম (সূরা নূর) অর্থাৎ খলীফার কাজ হলো ইসলাম ধর্মকে সদা সজীব ও ত্রুটিমুক্ত রাখা। শরীয়তে খলীফা এমন একজন নেতা, যার উপর আর কোন নেতা নেই। প্রতি শতাব্দীতে খলীফার বিদ্যমানতায় ইসলামের উপর যেসব আপত্তি উত্থাপিত হবে, এবং ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা যেসব অভ্যন্তরীণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, যুগ খলীফা তাঁর উপযুক্ত ও ন্যায় মীমাংসা দেবেন এবং যথাযথ সংস্কার করবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে সারাবিশ্বে যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই যুগ খলীফার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে –(ক) মজলিসে শূরা (খ) মেহমানদারী (গ)নেযামে বায়তুল মাল (ঘ) নেযামে ওসীয়্যত (ঙ) নেযামে ওয়াক্‌ফে নও (চ) কাযা বোর্ড (ছ) চল্লিশোর্ধ পুরুষদের সংগঠনসহ , মহিলা, যুবক, বালক-বালিকাদের নিজ নিজ সংগঠন (জ) বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ব্যবস্থা সহ অভ্যন্তরীণ প্রচার এবং মিশনারী ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যাদি। এ ব্যবস্থাপনার পুরোটাই খলীফায়ে ওয়াক্তের তত্ত্বাবধানে চলছে।

খলীফা বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে আমীর নিযুক্ত করেন। দেশীয় আমীরগণ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে যুগ খলীফার পরিকল্পনা ও কার্যাদি সম্পন্ন করেন। খেলাফত একটা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের কূটজাল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নয়, বরঞ্চ এক খলীফার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করাই এ খেলাফতের মহান উদ্দেশ্য। এ খেলাফত তথাকথিত অস্ত্রযুদ্ধের জিহাদকে সমর্থন করে না। এ খেলাফত জিহাদ বিন্ নফ্‌স, জিহাদ বিল মাল, জিহাদ বিল ইল্‌ম এ বিশ্বাসী। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, "বর্তমান যুগে তলোয়ার নয় বরং কলমের জেহাদ প্রয়োজন।"

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাত এ খেলাফতকে বরণ ও ধারন করে ইসলামকে বিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছিয়েছে। এ খেলাফতের বরকতে আহমদীয়া জামাত এ যাবত নিম্নোক্ত কাজগুলো করেছে।

- ১৮১টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- এ বছর সারা বিশ্বে জুলাই মাস পর্যন্ত ২০৯,৭৯৯ জন বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হয়েছেন।
- এ যাবত ৬০টি ভাষায় কুরআন মজীদের পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
- ১৯৮৪ থেকে এ যাবত সমগ্র বিশ্বে ১৩৭৭৪টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।
- আহমদীয়া জামাতের মাতা-পিতাগণ যুগ-খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় ৩০,০০০ বাচ্চাকে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে 'ওয়াক্‌ফে নও' এর স্কীমের আওতায় দিয়েছেন।
- MUSLIM TELEVISION AHMADIYYA INTERNATIONAL (MTA) এর মাধ্যমে অহোরাত্র ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ১৫০ জন কর্মী বিনা পারিশ্রমিকে ষ্টুডিওতে কাজ করছেন।

এ বছর (২০০৫ইং) লন্ডনের ৩৯তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫,২৪৯ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে যারা আজো যুগ-খলীফার সন্ধান পাননি, সেসব ভাইয়ের খেদমতে বিনীত আবেদন, স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয় নিয়ে, শত্রুতামূলক ধারণা মগজ থেকে দূরীভুত করে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বই-পত্র পড়ুন–এর রেফারেন্সগুলো কুরআন-হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখুন। রাতের গভীরে পরম সত্য করুণাময় আল্লাহ্-রাব্বুল আলামীনের দরবারে সেজদাবনত হয়ে সমাধান চান–অবশ্যই আল্লাহ্ আপনাকে যুগ-খলীফার সন্ধান দিবেন।

এ. কে. রেজাউল করীম

রমযান মাসের ফিদিয়া ও ফিৎরানার হার

এ বছর শহরের জামাতের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ৮৫০/ (আটশ পঞ্চাশ) টাকা এবং গ্রামের জামাতের জন্য ফিদিয়ার হার নূন্যতম ৬০০/= (ছয়শ) টাকা। *যারা সামর্থ্যবান তারা রোযা রাখা সত্ত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।*

এবছর ফিৎরানা ধার্য হয়েছে ৫০/ (পঞ্চাশ) টাকা। যারা অস্বচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিৎরানা প্রদান করবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

- পাক্ষিক আহমদীর নতুন বছর জুলাই- ২০০৫ থেকে শুরু হয়েছে। যাদের চাঁদা বকেয়া আছে অনতিবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বিনীত আবেদন করা হলো।
- যারা স্থানীয় জামাতে পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা দিয়ে থাকেন তারা অবশ্যই রশিদের ফটোকপি অথবা চিঠি দিয়ে সেক্রেটারী ইশায়াত বরাবর জানিয়ে দিবেন। যাতে আমাদের হিসাব রাখতে সুবিধা হয়। কেননা স্থানীয় জামাতে চাঁদা দিলে উক্ত চাঁদার রশিদ আমাদের দপ্তরে পৌছাতে অনেক সময় লাগে। অনেক সময় সরাসরি আসলেও সঠিক নাম ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে জন্য চিঠিতে নাম/ ঠিকানা রশিদ নং তারিখ ও টাকার বিবরণ লিখে জানাবেন। তা না হলে চাঁদা পরিশোধ করেও আপনি বকেয়াদার থেকে যেতে পারেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস তাঁর প্রেয়সী নাটোরের বনলতা সেনের প্রেমে আপ্লুত হয়ে 'বনলতা সেন' কবিতায় এক অনবদ্য প্রেমের আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তা পার্থিব জীবনের এক তুচ্ছ প্রেমের উপাখ্যান। সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার প্রেমে বিভোর হয়ে অনন্ত অকৃত্রিম প্রেমের আশেক হওয়ার মাঝেই প্রকৃত প্রেমের মাহাত্ম্য নিহিত। আর এ খাঁটি প্রেমে জীবনকে সার্থক ও সফলকারী এক আশেকে রসূল নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী।

এ মহান ব্যক্তি আবুল হাসেম খান সাহেব ১৮৮৩ সালে নাটোরের বিখ্যাত জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহিম খান চৌধুরী এবং মাতা জিন্নাতুন নেসা সাহেবা। তাঁর পূর্ব পুরুষ জামান খান প্রকাশ জুমুআ খান নাজিরের চাকুরী নিয়ে পাঞ্জাবের কসূর এলাকা থেকে অত্র এলাকায় আসেন। এর পূর্বে আফগানিস্তান থেকে পাঞ্জাবের কসূরে আসেন। পরে বিরাট সম্পত্তি ক্রয় করে নাটোরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা পাঠান বংশোদ্ভূত ছিলেন। সে সুবাদেই খান ও চৌধুরী উভয় উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে পাক-ভারতে উচ্চতর শিক্ষা, বংশ মর্যাদা ও অর্থ বিত্তে একাধিক উপাধি প্রাপ্ত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত অধিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষের সংখ্যা বিরল ছিল। জামাতে আহমদীয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রাঃ) যিনি জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট ও আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তিনি অনুরূপ একাধিক উপাধির বংশোদ্ভূত মর্যাদার অধিকারী সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাই বলা যায় বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ জমিদার ধার্মীক ব্যক্তি আব্দুর রহিম খান চৌধুরীর প্রথম সন্তান আবুল হাশেম সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন ধর্মপরায়ণ বিদুষনী মহিলা। তাই শৈশবেই পারিবারিক পরিবেশে তাঁকে

ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার হাতে খড়ি দেয়া হয়। বয়স বেড়ে যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সময় হয় তখন তাদের আদরের দুলালকে নাটোর হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। ছাত্র জীবনের শুরুতেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও মেধাবী। বাল্যকালেই তাঁর প্রতিভা ও মহান ব্যক্তিত্বের বিকাশ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তিনি ধার্মিক সৎচরিত্রবান ও আদর্শ ছাত্র হিসেবে স্কুলে ছাত্র শিক্ষক সকলের সুপরিচিত ছিলেন। শিক্ষকদের কাছে স্নেহভাজন হন। এ অবস্থার মাঝেই তিনি কৃতিত্বের সাথে স্কুলের এন্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করেন।

তাঁর এন্ট্রেন্স পাশ জমিদার বাড়ীর মুখকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। কীর্তিমান ফলাফল সকলের নিকট প্রশংসিত হয়। তাই পিতা আব্দুর রহিম সাহেব তার স্নেহাশীষ ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় দেশবরেণ্য হওয়ার লক্ষ্যে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করে দেন। এ কলেজ থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষার ক্রমধারায় ইংরেজী সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। সেকালে তাঁর মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ কলকাতা হাই কোর্টের নামজাদা এডভোকেট কিংবা বৃটিশ সরকারের ম্যাজিষ্ট্রেট হত। কিন্তু মানব প্রেমিক আবুল হাশেম সাহেবের মাঝে এদেশের অশিক্ষিত মানুষের নিকট শিক্ষার আলো জ্বেলে দেয়ার সাধ জাগে। তাই তিনি বি টি ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্মজীবনে মানুষ গড়ার কারিগরের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে BENGAL SENIOR EDUCATION SERVICE- এর অধীনে ASSISTANT DIVISIONAL INSPECTOR OF SCHOOL'S পদে ১৯১০ সালের দিকে কলকাতায় চাকুরীতে যোগ দেন। তখন কুষ্টিয়া জেলার বেড়ামারার ধরমপুরের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে হামিদুন্নেসা বেগমের সাথে প্রণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর এ সহধর্মিনী ধার্মীক ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। ১৯১১ কিংবা ১৯১২ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁকে চট্টগ্রামে বদলী করেন। তখন চট্টগ্রামে তিনি কর্ণফুলী নদীর পাড়ে সদরঘাটস্থ একটি বাসায় সপরিবারে বসবাস করতেন। সাথে স্ত্রীসহ দু'ইটি সন্তান আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী (শিবলী) ও মোমেনা বেগম (বুড়ি) ছিলেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন। স্কুলসমূহের শিক্ষার মানন্নোয়নে তিনি নিরলস কাজ করেছেন। ফলে শহরের শিক্ষিত মহলে তাঁর সুনাম ও সুপরিচিতি লাভ হয়। তাঁর মাঝে প্রবল ধর্মীয় অনুভূতি থাকায় তখন তিনি তাঁর সহকর্মী চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক আহসান উল্লাহ সাহেবের সাথে এক বিহারী পীরের মুরীদ হয়ে যান। এ পীরকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। এমন কি কখনও সেজদাও করতেন। পীরের মনোতুষ্টির জন্য চৌধুরী সাহেব তাঁকে অনেক অর্থ কড়িও দিয়েছেন। তখন তাঁর ধারণা ছিল এ পীরের উত্তম শিষ্যত্ব গ্রহণের মাঝেই হয়তো খোদার নৈকট্য লাভ করা যাবে।

সে সময় চৌধুরী সাহেব একদিন পরন্ত বিকালে চট্টগ্রাম শহরের পৌরসভার পুকুর ও গির্জার মাঝখানের রাস্তা দিয়ে চলার পথে হঠাৎ প্রাক্তন বঙ্গীয় ও প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন মৌলবী মোবারক আলী সাহেব চট্টগ্রাম মাদ্রাসা স্কুল বর্তমান সরকারী মুসলিম হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সাথে আবুল হাশেম সাহেবের পূর্ব থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। চৌধুরী সাহেব ছাত্র অবস্থায় যখন তাঁর ভগ্নীপতি বগুড়া বারের উকিল হাফিজউদ্দিন খন্দকার (যিনি খান বাহাদুর ও এম এল সি ছিলেন) এর বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন তখন থেকেই মোবারক আলী সাহেবের সাথে পরিচয় হয় এবং পরবর্তীতে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। দু'জনেই সমমনা মানুষ ছিলেন। সেজন্য দীর্ঘদিন পর চট্টগ্রামে হঠাৎসাক্ষাতে উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। চৌধুরী সাহেব তাঁকে নিজ বাসায় নিয়ে যান। তখন মোবারক আলী সাহেব তাঁর নিকট থেকে কেমন আন্তরিকতা পেয়েছিলেন তাঁর বর্ণনায় তিনি বলেন, চৌধুরী সাহেব আমাকে ধরে বললেন, আপনাকে আমার বাসায় থাকতে হবে। আমি তখন এমদাদ দারোগা সাহেবের (খান বাহাদুর

ফজলুল কাদির সাহেবের পিতা) বাসায় থাকতাম। আমার নিজের পৃথক খাবার বন্দোবস্ত ছিল। আমি বললাম দারোগা সাহেবের বাসায় থাকি, তারা আমাকে বেশ আদর যত্ন করেন। আমি আপনার এখানে আসলে তাদের মনে কষ্ট হবে। আবুল হাশেম সাহেব বলেন,আমি তাদেরকে বলব। আমি বললাম, আমি খাবারের জন্য কারও উপর বোঝা হতে চাই না। তিনি বললেন–আচ্ছা আমি আপনার জন্য পাকঘর তোলে দিবো। এরূপে এমন করে ধরলেন যে, আমি আর না করতে পারলাম না। পরে তিনি দারোগা সাহেবকে বলে রাজি করালেন এবং আমার পাকের ও চাকরের থাকার জন্য মুলি বাঁশের দুই কামরা বিশিষ্ট ছোট একখানা ঘর তোলে দিলেন। আমি হাশেম সাহেবের ওখানে বেশ সুখেই ছিলাম (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫)।

দুই বন্ধুর একই বাসায় বসবাসের সুযোগে মোবারক আলী সাহেব চৌধুরী সাহেবকে আহমদীয়া জামাতের সত্যতার উপর তবলীগ করতে থাকেন এবং তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ফলে ঐশীবাণীর সত্যতা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে এবং তাঁর পবিত্র মনে দানা বাঁধে। তখন মোবারক আলী সাহেব ব্যতীত চট্টগ্রামে অপর কোন আহমদী ছিল না। ১৯১৩ কিংবা ১৯১৪ সালে আবুল হাশেম সাহেবকে চট্টগ্রাম থেকে বরিশাল বদলী করা হয়। তবে চাকুরীর প্রয়োজনে তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে বরিশাল চলে গেলেও তাঁর আত্মার আত্মীয়, আত্মার মানুষ মোবারক আলী সাহেবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। দু'জনের মধ্যে সর্বদা ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। বিশেষতঃ ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সত্যতা নিয়ে নিবিড়ভাবে পত্রালাপ হতো। তাই মোবারক আলী সাহেব ১৯১৪ সালে বঙ্গদেশের পথহারা স্বজাতি বাঙালিদের পথের দিশায় তবলীগের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান থেকে জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট আলেম বুযুর্গ সাহাবী হযরত হাফেজ রৌশন আলী (রাঃ)কে নিয়ে আসলে তাঁকে নিয়ে বরিশাল যাবার জন্য চৌধুরী সাহেব অধীর আগ্রহের সাথে একাধিকবার পত্র লিখেন। অবশেষে টেলিগ্রামে অনুরোধ জানান। অতঃপর মোবারক আলী সাহেব বঙ্গ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐশীবাণীর

শান্তির পরসা বিলিয়ে দিয়ে সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে ঢাকা থেকে বরিশাল চলে যান। তখন সত্যানুসন্ধানী চৌধুরী খান সাহেব জামাতে আহমদীয়ার এ বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবীকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হন। পনের'শ বছর পূর্বে ইসলামের রবির উদয় দেশ আরবে আবু তালেব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও যেমন হযরত রসূল করীম (সঃ)কে ইসলাম প্রচারে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছিলেন, খোদাপ্রেমিক তাকওয়াপরায়ণ মানুষ আবুল হাশেম সাহেব জামাতে আহমদীয়ায় দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই বরিশালে একটি তবলীগি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এ অনুষ্ঠানের বর্ণনায় মোবারক আলী সাহেব বলেন–

তখন খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন বি এল সাহেব (যিনি এক সময় বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন) বরিশালের প্রধান উকিল এবং প্রধান নেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর সাথে যোগাযোগ করে আবুল হাশেম সাহেব আমাদের এক সভার আয়োজন করেন। মোখালেফাতকারী মোল্লারা এ সভায় হেমায়েতউদ্দিন সাহেবকে উপস্থিত দেখে কোন বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পায়নি। হযরত হাফেজ সাহেবের বক্তৃতা শুনে এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে আগন্তুক সকলেই মুগ্ধ হন। চৌধুরী সাহেব একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। তিনি বলেন, অনেক আলেমেরই বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান আর কারো দেখিনি। সাধারণতঃ আলেমরা যে বক্তৃতা করেন এতে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। কিন্তু হাফেজ সাহেবের বক্তৃতার বিষয়গুলো বেশ সুচিন্তিত এবং সুসজ্জিত ছিল। ঠিক যেন কোন বড় উকিল বিচারকের সম্মুখে যথাক্রমে এক একটি বিষয় শৃঙ্খলার সাথে বর্ণনা করে যান। সাধারণতঃ তাঁর বক্তৃতার বিষয় হত আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব, ধর্মের আবশ্যকতা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাদাকাত এবং তাঁর আগমন সম্বন্ধে আলেমদের ভুল ধারণা ও তা খন্ডন ইত্যাদি। হাফেজ সাহেবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি দু'চার ঘন্টা লম্বা বক্তৃতা করতে পারতেন এবং সময় সংক্ষেপ হলে অল্প কথায়ও তাঁর মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন। অথচ তিনি আরবী শিক্ষিত লোক। ইংরেজী মোটেই জানেন না এবং যার শিক্ষা মোটের উপর মৌখিকভাবেই হয়েছে। কারণ তাঁর এক চোখ অন্ধ ছিল এবং অপর চোখ দ্বারা তিনি খুব কম দেখতে পেতেন। তাঁর পক্ষে ঠিক একজন উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত লোকের মত শৃঙ্খলার সাথে ইংরেজীতে বক্তৃতা করা আবুল হাশেম খান সাহেবের নিকট একটি অত্যাশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। তখন ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষ ভাগ। ডিসেম্বর মাসের জলসার পূর্বেই আমাদের কাদিয়ান প্রত্যাবর্তনের কথা। আবুল হাশেম সাহেব বলেন, আপনারা যখন কলকাতা থেকে কাদিয়ান রওয়ানা হবেন, তখন আমিও আপনাদের সাথে যাবো, ইন্‌শাআল্লাহ্। (পাক্ষিক আহমদী, ৩০জুন ১৯৬৫)।

প্রোগ্রাম অনুসারে আবুল হাশেম সাহেব কলকাতা গিয়ে তাদের সহযাত্রী হন এবং জলসা সালানা কাদিয়ান ১৯১৪ সাল শুরুর ক'দিন পূর্বে এ ত্রিরত্ন কাদিয়ান পৌঁছেন। নবাগত চৌধুরী সাহেব পবিত্র ভূমি কাদিয়ানে পদার্পন করেই আল্লাহ্‌তাআলার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। জলসায় প্রাঞ্জল হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শুনে অভিভূত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এবং জামাতের বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবীদের সংস্পর্শে তিনি নূরের আলোতে আলোকিত হয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর দাবীর সত্যতা তাঁর হৃদয়পটে পুর্ণাঙ্গভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাই জলসার পর ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে মসজিদে মোবারকে আসর নামাযের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তখন হুযূর সানী (রাঃ) পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহার দরস প্রদান করেন এবং তাঁর বয়াতের জন্য খাস দোয়া করেন। ফলে চৌধুরী সাহেব সীরাত্বাল মোস্তাকিমের ঐশী পথের সৌভাগ্যবান হন। *(চলবে)*

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নেতৃবৃন্দের বিবৃতির আলোকে খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আসল চেহারা

ধর্ম জগতের সূচনালগ্ন হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ থেকে সত্যের ধারক ও বাহক মহা পুরুষগণ ও তাঁদের অনুসারীরা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে এসেছেন। তাঁদের বিরোধী ও সত্যের অস্বীকারকারীরা সম্ভাব্য যত পন্থায় সম্ভব তাঁদের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু পরিণামে নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরাই বিজয়ী হয়েছেন। নবীকূল শিরোমণি, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) তাঁর জাতির পক্ষ থেকে সবচে' বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। সেখানে তাঁর (সঃ) শিষ্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ) ও তাঁর জামাতের বিরোধিতা হবে না সেটা আমরা আশা করতে পারি না। সূচনালগ্ন থেকেই এ জামাতের বিরোধিতা হয়ে আসছে। আর এ বিরোধিতা বাংলাদেশেও হচ্ছে।

একটা চিহ্নিত মৌলবাদী মহল সারা দেশে জামাতে আহমদীয়ার বিরোধিতায় আন্দোলন করে যাচ্ছে। অবশ্য বাংলাদেশের সাধারণ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ কিন্তু তাদের সাথে নেই। মুক্ত চিন্তা, চেতনা ও বুদ্ধির মানুষেরা ও তাদের সংগঠনগুলো মৌলবাদীদের কার্যকলাপের বিরোধিতা ও ঘৃণা করে যাচ্ছে। এতে রয়েছেন বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, কলামিষ্ট, সাংবাদিক, পত্র-পত্রিকা (বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম), ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠন এবং বিচার ও আইন বিভাগের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। অপরদিকে **জামাতে আহমদীয়া বিরোধী যে আন্দোলন বাংলাদেশে হচ্ছে এর পুরোটার নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে মূলতঃ খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট ও তাদের দুই নেতা। এদের একজন হলেন সংগঠনের আমীর মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী এবং অপর জন নায়েবে আমীর মাওলানা মুফতি নূর হোসাইন নূরানী।** তাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইন্ধনে বিভিন্ন স্থানে আহমদী বিরোধী আন্দোলন, মিছিল, মিটিং ও বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। তাদের জঙ্গী কর্মসূচীর মাধ্যমেই আমাদের কয়েকটি মসজিদে তারা 'কাদিয়ানী উপাসনালয়' সাইন বোর্ড টানিয়েছে ও টানানোর চেষ্টা করেছে। কয়েকটি জামাতে সশস্ত্র হামলা করেছে। **তাদের এ পুরো আন্দোলনের স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে- "তারা ঈমানী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, দ্বীন ইসলামের খেদমতের জন্য, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায়, তওহীদি জনতাকে সাথে নিয়ে এ আন্দোলন করে যাচ্ছেন। এতে তাদের দুনিয়াবী কোন স্বার্থ জড়িত নেই।" কিন্তু জামাতে আহমদীয়া শুরু থেকে বলে আসছে- "খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আন্দোলন ঈমানী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। খোদার সন্তুষ্টি লাভ মোটেও তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের পুরো আন্দোলনের সাথে দুনিয়াবী স্বার্থ জড়িত বা দুনিয়াবী স্বার্থে এ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।"**

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের নেতৃবৃন্দের কিছু বক্তব্য যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তা আপনাদের সামনে গত সংখ্যায় তুলে ধরেছি। এখন এ বিষয়টি আমাদের সাথে একটু ভেবে দেখার জন্য আপনাদের সবিনয়ে অনুরোধ করছি। আসুন, তাহলে বিষয়টি একটু দেখি ঃ

❖ ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ রাজধানীর গ্রান্ড আজাদ হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে খতমে নুবওয়ত মুভমেন্টের নায়েবে আমীর মুফতি নূর হোসাইন নূরানী আহমদী বিরোধী সকল আন্দোলন আপাতত স্থগিতের ঘোষণা দেন। (৯ সেপ্টেম্বর প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ প্রভৃতির সৌজন্যে)।

ঐ সম্মেলন শেষ হওয়ার তিন চার মিনিটের মধ্যে সংগঠনের আমীর মাওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী এসে ঐ সম্মেলনস্থলে হাজির হন। আর সাংবাদিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন - **"সাংবাদিক ভাইয়েরা, নোট করুন- নূরানী ভারতের দালাল, 'র' এর এজেন্ট। সে 'র' থেকে টাকা খেয়েছে। আমাদের কাছে এর প্রমাণ আছে।"** (দৈনিক প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

এর উত্তরে নূরানী বলেন- **"কে বলে আমি ভারতের দালাল? আমাকে যারা ভারতের দালাল বলে, তারাই 'র' এর এজেন্ট"।** (দৈনিক প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

'তর্কাতর্কির এ পর্যায়ে হাতাহাতির উপক্রম হলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক দুজনের মাঝে এসে দাড়ান। দুজনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন-' (দৈনিক প্রথম আলো ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

পাঠক! দেখুন, একজন হলেন খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আমীর অন্যজন নায়েবে আমীর। যদি দুজন-ই সত্যবাদী হন তাহলে দুজনই নিজেদের বক্তব্য অনুসারে 'র' এর এজেন্ট হয়ে কাজ (বাংলাদেশে আহমদী বিরোধী আন্দোলন) করছেন। এখন আপনিই বলুন, 'র'-এর এজেন্টের পক্ষে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)ও ইসলাম ধর্মের প্রকৃত সেবা করা কি আদৌ সম্ভব?। আর যদি দু'জন 'র' এর এজেন্ট না হন তাহলে দুজন মিথ্যা বলেছেন। অথবা একজন সত্য বললে অপর জন মিথ্যা বলেছেন। ঐ অপর জন কে? .....

আর দুজন কিংবা একজন যদি মিথ্যাবাদী হন তাহলে তারা সত্য ধর্ম ইসলামের কর্ণধার কিভাবে হবেন? পবিত্র কুরআন বলে-লানাতাল্লাহি আলাল কাযেবীন- আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত মিথ্যাবাদীদের উপর। বলুন এ অভিসম্পাত কার উপর পড়বে? আর একটু চিন্তা করুন, এ রকম নেতারা যে সংগঠন চালায় ঐ সংগঠনই বা কেমন? এর দ্বারা কোন ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন কি আদৌ হতে পারে?

❖ ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তেজগাঁও রহিম মেটাল মসজিদের অফিসে খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মমতাজী বলেন- **"মুফতি নূরানী কত টাকার বিনিময়ে** তিনি খতমে নবুওয়ত আন্দোলন স্থগিত করে মুন্সিগঞ্জ থেকে আগামী সংসদ নির্বাচনে খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের নাম ভাঙ্গিয়ে নির্বাচন করার পাঁয়তারা করছেন এটা দেশবাসী জানতে চায়। (দৈনিক ইনকিলাব ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

❖ ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর **মুফতি নূর হোসাইন নূরানীর বিরুদ্ধে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ তুলেছেন খতমে নবুওয়তের নেতারা।** (সৌজন্যে- ১০ সেপ্টেম্বর দৈনিক প্রথম আলো ও ভোরের কাগজ)।

❖ **মুফতি নূর হোসাইন নূরানীর কাদিয়ানী কানেকশন উন্মোচিত হয়েছে-** খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট। (সৌজন্যে- দৈনিক ইনকিলাব, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

মুফতি নূরানীকে ৪ সেপ্টেম্বর খতমে নবুওয়ত সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। (সৌজন্যে- দৈনিক ইনকিলাব ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

❖ ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ এক বিবৃতিতে মুফতি নূরানী বলেন, **"মমতাজীর নবুওয়ত মুভমেন্টের ব্যবসার সকল গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়ায় তিনি বেসামাল হয়ে পাগলের প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন।** তিনি বলেন, জাতিকে জানাতে মমতাজীকে তার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান পেশ করতে হবে। অন্যথায় খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের সকল গোপন তথ্য দেশবাসীকে জানানো হবে। তাছাড়া **খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের যেহেতু কোন সাংগঠনিক বৈধতা নেই সেহেতু সংগঠনের আমীর হিসাবে তার বৈধতা থাকে কোথায়?** (সৌজন্যে- দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

❖ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ এক বিবৃতিতে মুফতি নূরানী বলেন, **"মাওলানা মমতাজীর অর্থ আত্মসাৎ, খতমে নবুওয়ত ব্যবসা ও বিভিন্ন অপকর্ম বিষয়ে যা ঘটেছে, তার দায়দায়িত্ব কিছুতেই ইশা আন্দোলনের হতে পারে না।"** (দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

পাঠক! একটু ভাবুন! দেখুন খতমে নবুওয়ত আন্দোলনটা আসলে কি? খতমে নবুওয়ত এর দুই কর্ণধার যারা সারাদেশে লাঠি হাতে নিয়ে খতমে নবুওয়তের নামে আহমদী বিরোধী মিছিল, মিটিং বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন তারা নিজেরাই বলে দিয়েছেন তাদের আন্দোলনটা কি এবং কেন? সংগঠনের আমীর মমতাজী বলেছেন- **নায়েবে আমীর নূরানীকে আহমদীরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। অর্থাৎ যিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন যার সাথে মমতাজীও সারা দেশে ঘুরলেন তিনিই শেষে ঈমান নয়, দ্বীনের সেবা নয়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নয়, দুনিয়াবী স্বার্থ ও তুচ্ছ বস্তু টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেলেন।**

অপর দিকে দেখুন, সংগঠনের নায়েবে আমীর নূরানী সংগঠনের আমীরকে উদ্দেশ্য করে কি বলছেন? বলছেন মমতাজী অর্থ আত্মসাৎকারী, তিনি খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের ব্যবসা করছেন। তাহলে কি দাঁড়াল? **সংগঠনের যে আমীরের নেতৃত্বে নূরানী এতোদিন আন্দোলন করেছেন সে আমীরও ঈমান নয়, দ্বীনের সেবা নয়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নয়, দুনিয়াবী স্বার্থ তথা টাকা আত্মসাৎ ও খতমে নবুওয়ত এর নামে টাকার ব্যবসা করার জন্য খতমে নবুওয়ত আন্দোলন করে যাচ্ছেন। আজ কোথায় গেল মমতাজীর সে দাবী আমরা কারও টাকা খেয়ে নামিনি? ঈমানী তাগিদে নেমেছি!** (২১ নভেম্বর, ২০৩ এনটিভি সংবাদে মমতাজী বলেছিলেন)।

নূরানী আরও বলেছেন- "অন্যথায় খতমে নবুওয়ত এর সকল গোপন তথ্য দেশবাসীকে জানানো হবে।" অর্থ আত্মসাৎ এর কথা জানালেন, খতমে নবুওয়ত ব্যবসার কথা বললেন। তারপর এমন কি গোপন জিনিস এ সংগঠনের রয়েছে যা নূরানী নায়েবে আমীর হয়ে দেখতে পেয়েছেন? কি সে গোপন তথ্য যা জানাচ্ছেন না, তবে জানিয়ে দিবেন বলে আমীর মমতাজীকে হুমকি দিচ্ছেন? পাঠক! নূরানী জানাননি বলে আমরা ঐ গোপন তথ্য জানতে পারলাম না। আপনারা চেষ্টা করে দেখুন, হয়তো জানতে পারবেন।

নূরানী আরো বলেছেন-"খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের যেহেতু কোন সাংগঠনিক বৈধতা নেই সেহেতু সংগঠনের আমীর হিসেবে তার বৈধতা থাকে কোথায়?"

যে সংগঠনের নামে দুই নেতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে সারা দেশে আহমদী বিরোধী আন্দোলন করে গেলেন, তারা এখন বলছেন, সেই সংগঠনের সাংগঠনিক বৈধতা নেই, সেই আমীরের, সেই নায়েবে আমীরের কোন বৈধতা নেই। তাহলে পাঠক! আপনারাই বিচার করুন, সেই আন্দোলনের যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, দিচ্ছেন ঐ দুই নেতা এর বৈধতা কতটুকু আছে? অথবা এ রকম একটি আন্দোলন বা সংগঠন দ্বারা প্রকৃত ইসলামী আদর্শ কখনও কি বাস্তবায়ন হতে পারে? ইসলামী আদর্শ, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ব্যক্তিত্বের চেহারা কি কখনও এমন হতে পারে?

❖ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ১১৬ বছর যাবৎ জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে এ ধরনের দুনিয়াবী স্বার্থ ও ধর্ম ব্যবসায় জড়িত সংগঠনের পক্ষ থেকে ভিত্তিহীন অপবাদ, রটনা, আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রমূলক বিরোধিতা হয়ে আসছে। এর সাথে ইসলামী আদর্শ, কুরআনের শিক্ষা ও সত্যের নুন্যতম সম্পর্কও নেই। সম্পর্ক যতটুকু আছে তা কেবল টাকার ও জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির। দেরিতে হলেও আজ নিজেরাই ঐ বিষয়গুলি স্বীকার করেছেন। এ কারণেই তাদের ঐ মিথ্যাচার ও টাকার ব্যবসার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত সংগঠনের অবিরত আন্দোলন, মিছিল, মিটিং, বিরোধিতা ও মিথ্যাচার ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট সত্য জামাত জামাতে আহমদীয়ার অগ্রগতি ও উন্নতিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। জামাত অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শাখা-প্রশাখা মেলে সারা বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অচেনা গ্রাম কাদিয়ান থেকে উৎসারিত নাম আহমদীয়াত আজ সারা বিশ্বে সুপরিচিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও এ চিত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে। বাক্ষণবাড়িয়ার গন্ডি থেকে আহমদীয়াত আজ সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এর উন্নতি ও প্রসারের গতি আরও দ্রুত হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা।

❖ পাঠক, একটু চিন্তা করুন! জামাতে আহমদীয়া তাঁদের খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে **লানাতাল্লাহি আলাল কাযেবীন** (অভিসম্পাত মিথ্যাবাদীদের উপর) ও **আল্লাহুম্মা মাযযেকহুম কুল্লা মুমাযযিকিন**(অনুবাদ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শত্রুদেরকে সম্পূর্ণরূপে খন্ড-বিখন্ড করে দাও) এ দোয়া পড়ে যাচ্ছে। **আহমদী বিরোধী আন্দোলন খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের খতমে নবুওয়ত ব্যবসা, টাকার খেলা, মিথ্যাচার ও ভিত্তিহীন কর্মকান্ডের চিত্র জাতির কাছে প্রকাশিত হওয়া; ইশা আন্দোলন থেকে দু'জনকে বহিষ্কার, খতমে নবুওয়ত মুভমেন্টের ভাঙ্গন। এগুলো কি তাদের উপর ঐশী অভিসম্পাত, অপমান ও লাঞ্ছনা নয়? এটা কি খন্ড বিখন্ড হওয়ার চিত্র নয়? এটা কি জামাতে আহমদীয়ার দোয়া কবুলের স্বপক্ষে ঐশী সমর্থন নয়?**

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আশা করি বিষয়গুলো একটু মুক্ত চিন্তা নিয়ে ভেবে দেখবেন। এই প্রত্যাশায় পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি শুনিয়ে লেখা শেষ করছি- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন-"হে মানব মন্ডলী! শ্রবণ করো! কেননা এটা সেই সত্তার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে আছেন। তিনি তাঁর এই জামাতকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিবেন আর অকাট্য যুক্তি ও দলিল বলে অন্যান্য সবার উপর এদেরকে জয়যুক্ত করবেন। সেই সময় সমাগত বরং সন্নিকটে যখন পৃথিবীতে এটাই একমাত্র মতবাদ হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদাতাআলা এই মতবাদ আর এই জামাতকে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে অসাধারণ আশিষ বর্ষণ করবেন।" *(তাজকিরাতুশ্ শাহাদাতাইন-৬৬ পৃষ্ঠা)*

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন

এমটিএ ডাইজেস্ট

দাজ্জাল ও মসীহের কা'বা তাওয়াফের তাৎপর্য

৪ঠা আগষ্ট ধারণকৃত একটি মজলিসে ইরফান (উর্দূ প্রশ্নোত্তর সভা) ১১ আগষ্ট (২০০১) সম্প্রচারিত হয়। খুব সম্ভবতঃ এটি ছিল ইউ,কে জলসার পর এমটিএ-তে প্রচারিত প্রথম প্রশ্নোত্তর সভা। এতে হুযূর (রাহেঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, হাদীসের কোন কোন বর্ণনাতে আছে দাজ্জাল ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ কা'বা তাওয়াফরত থাকবে। এর অর্থ কী? হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এটি রূপক একটি বর্ণনা যার অর্থ হলো দাজ্জালি শক্তি ইসলামকে বা মুসলমানদের পরিবেষ্টন করে থাকবে যেমনটি এখন আছে। অপরপক্ষে আহমদী জামাত ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পক্ষ থেকে সকলকে ঘিরে আছে, দাজ্জালী চক্রের বেষ্টনীকে আমরা চূর্ণ করছি।

ইউরোপে পাদ্রীদের বিরোধিতা স্বরূপ

এ অনুষ্ঠানেই একজন জানতে চান পাকিস্তানে মোল্লারা যেভাবে আমাদের বিরোধিতা করে থাকে ইউরোপে পাদ্রীরাও একইভাবে তা করে কিনা। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, বিরোধিতা তারা করে ঠিকই, তবে দাজ্জালের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল গোপনীয়তা। ফলে তারা গোপনে এবং কূটনৈতিকভাবে (Diplomatically) আমাদের বিরোধিতা করে থাকে।

ভারত, আমেরিকা ও পাকিস্তান সফরের সম্ভাব্যতা

এ অনুষ্ঠানে হুযূর (রাহেঃ)-কে এরপর তিনটি পৃথক প্রশ্ন করা হয় ভারত, আমেরিকা ও পাকিস্তানে কবে হুযূর (রাহেঃ) যাবেন তা জানতে চেয়ে। ভারত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ নিয়ে যাবেন। আমেরিকা সম্পর্কে বলেন, সেখানেতো গিয়েছি। বার বার কেবল ধনী দেশে গেলেতো চলবে না আফ্রিকাতে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বাকীগুলো শেষ করি, তারপর আবার দেখা যাবে। আর পূর্বে যেমন কাজ দিয়ে এসেছি, সেগুলোই আগে শেষ করুন, তারপর বলুন। শেষে 'পাকিস্তানে কবে আসবেন' এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, মোল্লারাতো জোর চেষ্টা করছে যেন না যেতে পারি। শেষ পর্যন্ত তা-ই হবে যা আল্লাহ্তাআলা চাইবেন। ফ'আলুল লিমা ইউরীদ, অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করেই ছাড়েন।

প্রিয় খেলা

১৩ই আগষ্ট সম্প্রচরিত (৮ই আগষ্ট ধারণকৃত) লাজনার নবীনা (Young) সদস্যাদের সাথে মুলাকাত অনুষ্ঠানে হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়। তাঁর প্রিয় খেলা কোন্‌টি হুযূর (রাহেঃ) বলেন, বর্তমানে আমার প্রিয় খেলা ব্যাডমিন্টন। তবে আমি সবচে' ভাল পারি ঘোড়ায় চড়তে, স্কোয়াস এবং কাবাডি খেলতে। এখন ব্যাডমিন্টনই খেলি। জলসায় মেহমান চলে গেলে হলে (খুব সম্ভবতঃ মাহমুদ হল) এ ব্যবস্থা হবে। অতীতের মজার ঘটনা বলতে গিয়ে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, একবার ফুটবল খেলায় গোলকিপার ছিলাম। একটি শট (খুব সম্ভবতঃ পেনাল্টি-সংকলক) ঠেকানোর জন্য লাফ দিয়েছি। যদিও আমি ঠিকমত বুঝতে পারি নি, বল সোজা আমার মুখে লেগে ফিরে যায়। সবাই উল্লাসে আমাকে কাঁধে নিয়ে অনেকখানি ঘুরে আসে।

পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন কত দূরে?

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন জানতে চান ইলহামের আলোকে হুযূর (রাহেঃ)-এর পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন কতদূরে। হুযূর (আইঃ) বলেন, এটি নির্ধারিত নয়। দুই-তিন বছরের মধ্যে নাও হতে পারে, আবার হতেও পারে। তবে "ক্রোড়ো..." (কোটি কোটি ...)-র যে ইলহাম আছে তাতে আমার ধারণা যে, বছর তিনেক বা এরূপ সময়ের আগে না-ও হতে পারে।

বাল্যকালে জলসার দায়িত্ব

হুযূর (রাহেঃ)-কে নাসেরাতের এক সদস্যা প্রশ্ন করে, তাঁর বয়সে জলসায় হুযূর (রাহেঃ) কী দায়িত্ব (Dut) পালন করতেন। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, তোমার বয়স কত? সে

বলল, দশ। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এ বয়সে সাধারণতঃ রুটি বা তরকারী বন্টন করতাম।

আফ্রিকার বাদশাহ্দের সম্পর্কে অনুভূতি

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন জানতে চান, এবার জলসার সময় আফ্রিকার বাদশাহ্দের সাথে যে সাক্ষাৎ হ'ল তা কেমন লেগেছে। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, আমার তো ভালোই লেগেছে তাঁদের কেমন লেগেছে জানি না। সংবাদ পেয়েছি যে, তাঁরা ফিরে গিয়ে বড় সম্বর্ধনা পেয়েছেন। তাদের এলাকার লোকেরা এমটিএ-তে জলসা দেখেছেন। তাঁদেরকে দেখানোতে ঐ এলাকার মানুষ খুব খুশি হয়েছে। ফিরে গিয়ে তাঁরা অনেক বড় সম্বর্ধনা পেয়েছেন। আশা করি তাদের সাথে আমার যে কথা হয়েছে সে অনুযায়ী তাঁরা আগামী বছরও কাজ করবেন।

আমেরিকাবাসীদের তবলীগ প্রসঙ্গে

এ অনুষ্ঠানে আমেরিকাবাসীদের মাঝে তবলীগ প্রসঙ্গে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, জাতিগতভাবে তাদের মাঝে একটা অহংকার আছে। তবে তাদের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও আছেন; বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে। এদের মধ্যে তবলীগ করলে সফলতা আসতে পারে।

ছাত্রাবস্থায় হুযূর (রাহেঃ)-এর কী হওয়ার ইচ্ছা ছিল

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন জানতে চান, ছাত্রাবস্থায় হুযূর (রাহেঃ)-এর কী হওয়ার ইচ্ছা ছিল। হুযূর (রাহেঃ)বলেন, কিছু না। আল্লাহ্ মাফ করুন, ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত নিষ্কর্মা ছিলাম। মা চাইতেন ডাক্তার হই। আমার ইচ্ছা ছিল না। তাদের জীবন যাত্রা

অন্য রকম। সারা দিন তাদের যেভাবে কাটে তা পসন্দ করতাম না। শেষ পর্যন্ত মায়ের দোয়া কবুল হ'ল। হোমিও ডাক্তার হয়ে গেলাম। এতে অন্য কাজও চলে, ডাক্তারীও চলে।

বাংলাদেশে তবলীগি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য হুযূর (রাহেঃ)-এর তাগিদ

১৫ই আগস্ট সম্প্রচারিত (৮ই আগস্ট ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনষ্ঠানে খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে পশ্চিম বঙ্গে এ বছর যে ২৬ লক্ষ বয়াত হয়েছে তাদের তরবিয়ত কীভাবে সম্ভব হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ করেন। হুযূর (রাহেঃ) বরং বাংলাদেশের দিকে প্রসঙ্গ নিয়ে গিয়ে বলেন যে, আপনাদের তো ঈর্ষা হওয়া উচিত যে, তারা এতখানি অগ্রগতি করছে। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আপনাদের যখন সময় আসবে মাশরেক আলী সাহেব (আমীর পশ্চিমবঙ্গ আসাম)-এর পরামর্শ নিবেন। বাংলাদেশে অবশ্য অবস্থা ভিন্ন। ভারতের সরকার ও প্রশাসন সাধারণভাবে নিরপেক্ষ, বাংলাদেশে মোল্লাদের প্রভাবাধীন। তবে বাংলাদেশে পূর্বে যখন আমি যেতাম, তখন দেখতাম যে, আলোচনায় কট্টর মোল্লাও মাথা নোয়াতেন। জানিনা এর মধ্যে কি হ'ল? তবে আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন। সামনের বছর এক লক্ষের জন্য চেষ্টা করুন।

পবিত্র কুরআন থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

কুরআন থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা কীভাবে প্রমাণ করা যায়, এরূপ এক প্রশ্ন এ অনুষ্ঠানে করা হ'লে হুযূর (রাহেঃ) প্রথমতঃ সূরা জুমুআর 'ওয়া আখারিনা মিনহুম ... আয়াতটি উল্লেখ করেন যেখানে 'আখারীন' (পরবর্তী অন্যদিগের) মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের উল্লেখ রয়েছে। এর ব্যাখ্যা বুখারী কিতাবুত্ তফসীরের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্বয়ং এই করেছেন যে, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে গেলেও পারশ্য বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তি সেখান থেকে নামিয়ে আনবেন। এর উপর আলোকপাতের পর হুযূর (রাহেঃ) সূরা কিয়াম-এর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের যে উল্লেখ রয়েছে তার দিকে ইশারা করেন। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসটি পাশাপাশি উল্লেখ করে হুযূর (রাহেঃ) একে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক জবরদস্ত দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

সূর্যের গন্তব্য

২৯শে আগস্ট সম্প্রচারিত (২২শে আগষ্ট ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে কুরআনে 'আশ শামসু তাজরী লি মুস্তাকার্ লিল্লাহা... আয়াতের বরাতে এ প্রশ্ন করা হয়, এর অর্থ এই যে, সূর্য মহাশূন্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে যাচ্ছে, যাকে কখনো কখনো (Solar apex) বলা হয়। হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন, এটিও এর অর্থ হতে পারে। তবে সূর্যতো একা কোন দিকে যাচ্ছে না বরং মহাবিশ্বে সূর্যের যে গতি তা সমগ্র সৌরজগতকে সাথে নিয়েই। হুযূর (রাহেঃ) আরো বলেন সূর্য তার পরিণতির দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ সূর্য একদিন শেষ হয়ে যাবে।

কেয়ামতে কি পুরো বিশ্ব-জগত ধ্বংস হয়ে যাবে?

কেয়ামতে পুরো মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযুর (রাহেঃ) বলেন না, বরং কেবল মানবজাতি বা এ পৃথিবী ধ্বংস হবে। আর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনে রয়েছে যে আল্লাহ্তাআলা নূতন উন্নততর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন।

ভ্রুণের উপর বাধ্যতামূলক জেনেটিক পরীক্ষা

ব্রিটেনে সরকার মানব-ভ্রুণের উপর জন্মের পূর্বেই বাধ্যতামূলক জেনেটিক পরীক্ষার আইন করতে পারে এরূপ প্রেক্ষাপটে এ অনুষ্ঠানে হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এরূপ আইন করা হলে আহমদীদের কি করা উচিত হবে? হুযূর আকদাস (রাহেঃ) বলেন, সরকার যদি নির্দেশ দেয় তাহলে মেনে নিন। তারা এটাই বলছেন যে, এ পরীক্ষাগুলো মানব কল্যাণের কারণ হবে। পূর্বে এখানকার মানবতাবাদী (Humanist) গ্রুপগুলো এর বিরোধিতা করতো। এখন তারাও মোটামুটিভাবে বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে।

আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক অন্তরে মোহর মারার প্রকৃত অর্থ

এ অনুষ্ঠানের আরেকটি প্রশ্ন এই ছিল যে, কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, কতিপয় লোকের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন তাহলে না বুঝা বা না মানার জন্য কেন শাস্তি পাবে? উল্লেখ্য ইসলামে বিপক্ষে আর্যসমাজিদের এটি ছিল একটি বড় আপত্তি। হুযূর (রাহেঃ)-এর উত্তরে বলেন, প্রয়াশঃই এক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বস্তুত "আল্লাযীনা কাফারূ সাওয়াউন আলায়হিম..."এর অর্থ হবে অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা এমন যে, সিদ্ধান্ত করে রেখেছে যা-ই আসুক আমরা মানবো না–এরূপ লোকদের পরিণতি আল্লাহ্তাআলা পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে দেন।

নেক ব্যক্তির জীবন সংহারের সময় দ্বিধাবোধ

খুব সম্ভবতঃ হাদীসে আছে নেক ব্যক্তিদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্তআলা বা ফিরিশ্তাগণ দ্বিধাবোধ করেন। এ অনুষ্ঠানে এর অর্থ জানতে চাওয়া হলে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, নেক ব্যক্তিরা তো সদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। এখানে যে দ্বিধার কথা বলা হয়েছে তা তাদের জন্য নয়, বরং তারা যাদেরকে পিছনে ফেলে আসবেন তাদের প্রতি করুণা থেকেই এ দ্বিধাবোধ।

ইশার নামাযের সময়

ফযরের পূর্ব পর্যন্ত ইশার নামায পড়া যায় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহেঃ) খুব সম্ভবতঃ বলেন যায়, তবে প্রথম রাতে পড়া উত্তম। আর কারো কারো ধারণা যে, মধ্য রাতে নামায পড়া নিষিদ্ধ। এটা ঠিক নয়। নামায নিষিদ্ধ সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কালে এবং মধ্য দিবসে।

সংকলন–**আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক**

মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী (সাঃ ন্যাঃ আঃ) সাহেবের স্মরণে যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৯/৯/০৫ ইং মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক সাহেবের যিকরে খায়ের সভা আহমদীয়া মুসলিম জামাত বি. বাড়ীয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পরে মুক্ত আলোচনা করেন জনাব শেখ মোশারফ হোসেন, মসিউর রহমান, ছিদ্দিক আহমদ খালেদ, শেখ সাদী এবং খন্দকার মোস্তাক আহমদ। মরহুমের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব এ, বি, এম, শফিউল আলম বরকত, জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ ও মৌঃ এনামুল হক রনি মোয়াল্লেম। এ অনুষ্ঠানে সাবেক আমীর বি, বাড়ীয়া মরহুমের লেখা ৫১ পুস্তকের নামের তালিকা পড়ে শুনান। তারপর মরহুমের স্বরচিত একটি নযম পাঠ করেন জনাব মৌশাদ আহমদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনাসহ ১৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৯ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/৯/০৫ বাদ মাগরিব (বৃহস্পতিবার) হতে ১৬/৯/০৫ (শুক্রবার) বাদ জুমুআ খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরের ৯ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত ইজতেমায়১৯ আতফাল ও ৪৯ জন খোদ্দাম স্বতঃস্ফূর্ততার সহিত অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে বার্ষিক ইজতেমা উদযাপিত

গত ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৩৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ইং সেপ্টেম্বর ২০০৫ সাল রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.৩০ মিনিট অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কেন্দ্র থেকে আগত লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর সাহেবা। এরপর লাজনা ও নাসেরাতদের কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের ৩য় অধিবেশন শুরুতে স্থানীয় জামাতের আমীর ও মুরব্বী সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সদর সাহেবা বক্তব্য প্রদান করেন। এতে ১৫৯ জন লাজনা ও নাসেরাত অংশগ্রহণ করে। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সেক্রেটারী তরবীয়ত
লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম

তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লার উদ্যোগে গত ২৩ ও ২৪ শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং তারিখে দুটি সেশানে তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র থেকে আগত জনাব মৌলভী হাফেজ সেকান্দর আলী, মীর মুবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ বাংলাদেশ, তাসাদ্দক হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ও মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী সাহেব।

উক্ত সেমিনারে জেরে তবলীগসহ মোট নারী ও পুরুষ ১৪০ জন উপস্থিত ছিল। এ অনুষ্ঠানে মোট ২১ জন বয়াত গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

দোয়ার এলান

আমার পুত্র আহমদ তাইয়্যেব ২০০৫ইং সনের এস.এস. সি. পরীক্ষায় জি,পি,এ-৫.০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার ভবিষ্যৎ দুনিয়াবী ও রূহানী সফলতার জন্য সকলের দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
মাঞ্জারাতুন নেছা

শুভ বিবাহ

❖ জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল এর কন্যা মোসাম্মাৎ মোবাশ্বেরা বেগম সাং দক্ষিণ শ্রীপুর গণকবাড়ী, সাভার-ঢাকা-এর বিয়ে জনাব মোহাম্মদ নূর মিয়া এর পুত্র জনাব, শেখ মোহাম্মদ সেলিম সাং ঘাটুরা-বি বাড়ীয়া এর সাথে ১,০০০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৪/১২/০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ের রেজি ঃ নং ০৪৭৮/০৫

❖ জনাব মিজানুর রহমানের কন্যা মোসাম্মাৎ জান্নাতুন নেছা (ময়না) সাং যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর-সাতক্ষীরা-এর বিয়ে জনাব মোহাম্মদ আবদুল খালেক সানা এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সানা সাং বেতাল বাজার, উত্তর বেদকানি, কয়রা-খুলনা এর সাথে ৩০,০০১/- (ত্রিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৪/১০/০৪ অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ের রেজি ঃ নং ০৪৭৯/০৫

❖ জনাব শওকত আলী এর কন্যা মোসাম্মাৎ হাসিনা বেগম সাং রেড়াজালী, গৌরারং জেলা-সুনামগঞ্জ এর বিয়ে জনাব আব্দুল ওয়াহাব এর পুত্র জনাব এহসান শোয়েব সাং ১০০৪ পূর্ব মেড্ডা, বি-বাড়ীয়া এর সাথে ১,০০০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৪/১২/০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ের রেজি ঃ নং ০৪৮০/০৫

❖ জনাব মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেদ এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফুলনা মোবারেকা সাং ঘাটুরা বি-বাড়ীয়া এর বিয়ে জনাব মরহুম আবুল হোসেন এর পুত্র সোহেল আহমদ সাং সুহিলপুর বি-বাড়ীয়া এর সাথে ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৫/১২/০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ের রেজি ঃ নং ০৪৮১/০৫

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন।

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১

নীচতলা

রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১

গুলশান ২ ঢাকা।

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

ধানসিড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা

(রাপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 8th Issue October 31, 2005. ❑ Tk. 10.00
Fortnightly The AHMADI রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১। প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২। প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩। সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪। **রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন** [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫। **রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব** [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬। **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নূহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম** [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭। **আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে**। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)
অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯। দুরূদ শরীফ (অর্থসহ সালাত বই থেকে) প্রত্যেহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৮-১৪ জুলাই ২০০৫ তারিখের সৌজন্যে)

হযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহরিকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com